দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ২৯ জুন, ২০২৬।। ১৪ আষাঢ়, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস
২১ জুন

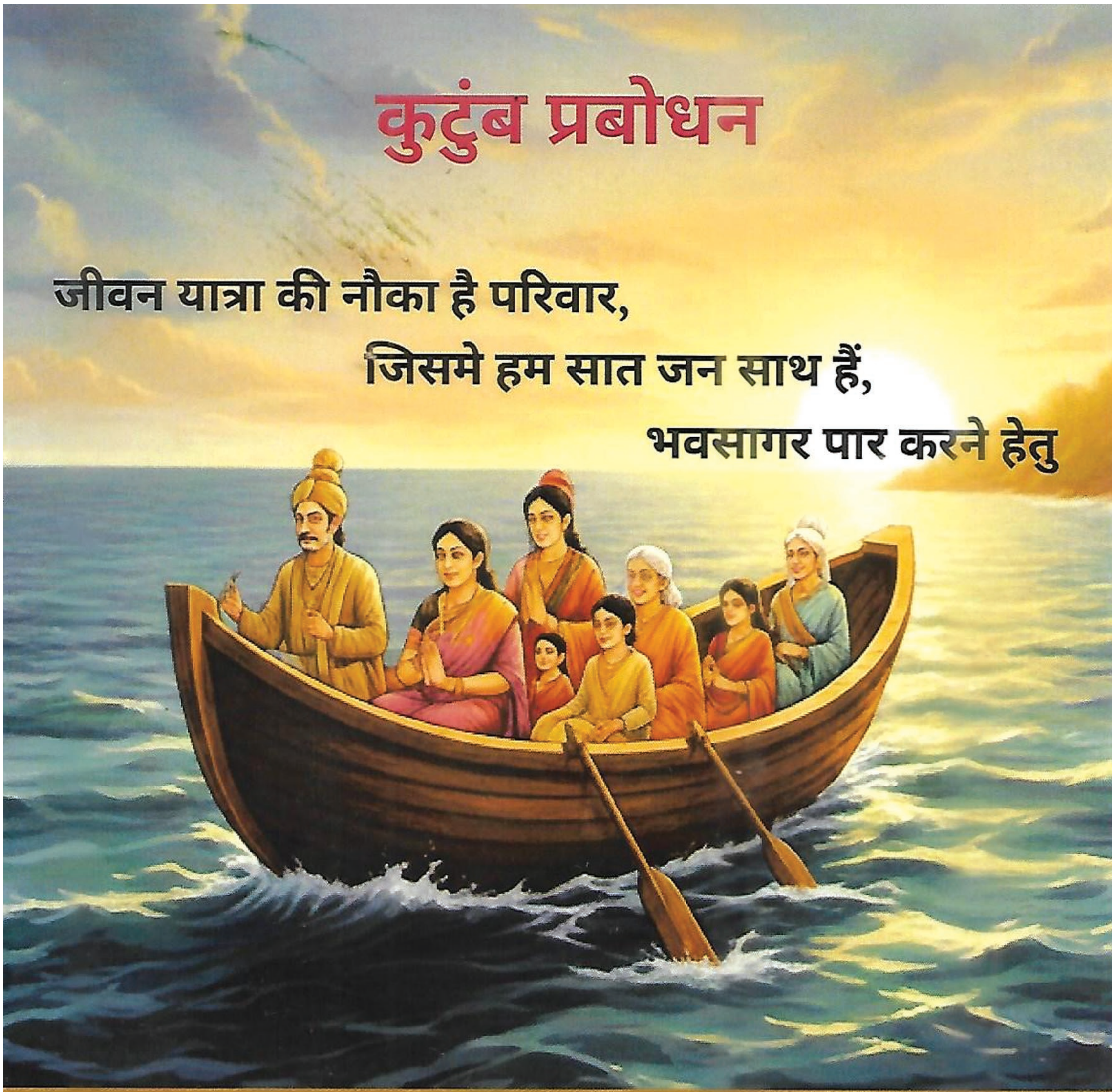

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ১৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২৯ জুন - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

১২৫ বছরের ‘হিন্দু বিরোধিতা’কে এবার রাজ্য থেকে উপড়ে ফেলে দিতে হবে ‘নয় এ মধুর খেলা’
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

চলুন দিদি রাজ্য বাজেটের নিন্দা করি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

বিস্মিত ও আনন্দিত করেছে ☐ ড. মনমোহন বৈদ্য ☐ ৮

বাঙ্গালি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মোবাইল ফোন না দিয়ে তাদের এবার পড়ার টেবিলে পাঠানোর সময় এসেছে
☐ কৌটিল্য ☐ ১০

পশ্চিম বাংলাদেশ হওয়া থেকে বেঁচে গেল পশ্চিমবঙ্গ
☐ অমিত কুমার চৌধুরী ☐ ১১

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বারো বছরের পথ চলা—অর্জন, রূপান্তর ও নতুন ভারতের অভিযাত্রা
☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১৩

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তানপ্রেমী
☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ১৫

অসংখ্য প্রশ্নের মীমাংসা খোঁজা এক অভিজ্ঞতা
☐ চন্দ্রশেখর মণ্ডল ☐ ১৭

ভক্তি বনাম অবমাননা : বিসর্জনের পর দায়িত্ব কোথায়?
☐ শ্রীভৈরব ☐ ১৮

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস : সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
☐ আশিস কুমার পাল ☐ ২৩

যোগাসন : প্রকৃত যোগের পথে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যম
☐ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ☐ ২৪

কলকাতায় উদ্‌যাপিত হলো ‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৬’
☐ ২৬

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ☐ রবিব্রত ঘোষ ☐ ৩১

পাথরের পাতায় খোদিত বৈজ্ঞানিক মহাকাব্য—কোনার্ক সূর্যমন্দির
☐ জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ ☐ ৩৪

নীরব জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের পথে কোচবিহার
☐ সুমন কল্যাণ ভদ্র ☐ ৩৭

কোচবিহারবাসী এবার আশাবাদী হয়ে উঠতেই পারে
☐ অশোক কুমার ঠাকুর ☐ ৩৮

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতাজী ‘ভ্যানিশ’-এর নেপথ্য রহস্য
☐ ড. জয়ন্ত চৌধুরী ☐ ৪৩

যেখানে গঙ্গা সরে যায়, পবিত্রতা থেকে যায়—বঙ্গের নদী-ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির দীর্ঘ অধ্যায় ☐ বিধান হালদার ☐ ৪৬

কমরেড! হাসান সুরাবর্দির গুণগান না গোপাল মুখার্জির অবদান : কার সঙ্গে আপনারা? ☐ বিপ্লব বিকাশ ☐ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ☐ **অঙ্গনা : ২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **খেলা : ৩৯** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
৬ জুলাই
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৬ জুলাই
২০২৬

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিক্ষাবিদ, জননেতা এবং বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী। ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙ্গালি জাতি তাঁর কাছে চিরঋণী।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশি বর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিশ্বকে ভারতের এক অনন্য উপহার — যোগ

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ তাহার জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবজাতি তথা সমগ্র বিশ্বকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহার কারণেই ভারতবর্ষ একদা বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্বের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ তাহা অকপটে স্বীকারও করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন হইল মানবজাতির বিকশিত জীবন এবং জগতের মৌলিক প্রশ্নাবলী সমন্বিত এক চিন্তাভাবনার সমষ্টি। ইহা শুধু শুষ্ক তাত্ত্বিক আলোচনা নহে; অতীন্দ্রিয় চর্চা, আধ্যাত্মিক চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে মনুষ্য জাতিকে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট হইতে পরিত্রাণের উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে ইহাকেই 'মোক্ষ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার অনুশীলনের জন্য ভারতবর্ষ ষড়দর্শনের প্রণয়ন করিয়াছে। যেমন, যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত আলোচনাকে ন্যায়দর্শন বলা হইয়াছে। ইহার প্রণেতা মহর্ষি গৌতম। বস্তু ও পরমাণুতত্ত্বের বিশ্লেষণকে বৈশেষিক দর্শন বলা হইয়াছে। ইহার প্রণেতা মহর্ষি কণাদ। পুরুষ ও প্রকৃতি (বস্তু ও চেতনা)-র দ্বৈতরূপের বিশ্লেষণ ও আলোচনাকে সাংখ্যদর্শন বলা হইয়াছে। ইহার প্রণেতা মহর্ষি কপিল। বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ও কর্মের গুরুত্ব বিষয়ক বিশ্লেষণ ও আলোচনাকে পূর্বমীমাংসা দর্শন বলা হইয়াছে। ইহার প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনী এবং উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রহ্ম ও আত্মার সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনাকে উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন বলা হইয়াছে। ইহার প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাস। এই রকমই ধ্যান, প্রাণায়াম ও চিত্তবৃত্তি নিরোধের মাধ্যমে জাগতিক দুঃখ-কষ্টকে জয় করিয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার পথ ও পদ্ধতিকে যোগদর্শন বলা হইয়াছে। ইহার প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি। এই ষড়দর্শন জীবন ও জগতের দিকনির্দেশের এক-একটি শাখা। যোগদর্শন অনুশীলনে শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ঘটানো সম্ভব হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার মানসিক প্রশান্তি। জাগতিক দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করিয়া আত্মোপলব্ধি ও মোক্ষলাভের ইহা একটি বিজ্ঞানসম্মত পথ। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্র গ্রন্থে এই পদ্ধতির বিশদে আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি যোগানুশীলনের জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি — এই আটটি পথের কথা বলিয়াছেন। এই যোগবিজ্ঞান অনুশীলন করিবার জন্য বিদেশের বহু মুমুক্ষু ব্যক্তি ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে আশ্রয় লইয়া জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়াছেন।

বিশ্ববাসী অকপটে স্বীকার করিয়াছে যে, যোগবিজ্ঞান বিশ্বকে ভারতের এক অনন্য উপহার। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ জুন তারিখটিকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' রূপে ঘোষণা করিয়াছে। সেই অনুসারে ২০১৫ সাল হইতে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও সম্প্রীতির প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে ভারতীয় যোগ। প্রতি বৎসর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ভারত সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদান করিতেছে। তাহার ফলে এই যোগ বিশ্বের সর্বত্র — গ্রাম-শহর, জল-পাহাড়-জঙ্গল মানুষের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে। প্রতি বৎসর একটি মূলভাবকে সম্মুখে রাখিয়া আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। ২০১৫ সালে মূলভাব ছিল 'সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য যোগ'। ২০১৬ সালে ছিল 'স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগ'। ২০১৭ সালে ছিল 'সুস্বাস্থ্যের জন্য যোগ'। ২০১৮ সালে ছিল 'শান্তির জন্য যোগ'। ২০১৯ সালে ছিল ' হৃদরোগ থেকে রক্ষার জন্য যোগ'। ২০২০ সালে ছিল 'স্বাস্থ্যের জন্য যোগ– বাড়িতে যোগ'। ২০২১ সালে ছিল 'সুস্থতার জন্য যোগ'। ২০২২ সালে ছিল 'মানবতার জন্য যোগ'। ২০২৩ সালে ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকমের জন্য যোগ'। ২০২৪ সালে ছিল 'সমাজের জন্য যোগ'। ২০২৫ সালে ছিল 'এক বিশ্ব এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ'। এবার ২০২৬ সালের জন্য ছিল 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ'। প্রতিটি ভারতবাসীর গর্বের বিষয় যে, ভারতীয় ঋষিগণ প্রদত্ত পাঁচসহস্র বৎসরের প্রাচীন এই যোগ আজ সমগ্র বিশ্ব গ্রহণ করিয়াছে। এমনকী ইসলামি দেশগুলিও সানন্দে ইহার অনুশীলন করিতেছে। এই বৎসর প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসটি কলকাতাবাসীর নিকট তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় হইল, যোগের মাধ্যমে যখন বিশ্বব্যাপী এক সৌহার্দ্যের পরিবেশ রচিত হইতেছে তখন পশ্চিমবঙ্গের এক কমিউনিস্ট নেতা রেড রোডে যোগ সমাবেশের সরকারি অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিয়া কলকাতা উচ্চ আদালতে অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলেন। কিন্তু আদালত তাহার অভিযোগ গ্রহণ করে নাই। যখন একটি ভারতীয় সাধনা পদ্ধতির বিশ্বস্তরে উত্তরণ ঘটিতেছে তখন তাহার বিরোধিতার ফলে কমিউনিস্টদের নগ্ন ভারতবিরোধী চরিত্র আর একবার প্রকাশ্যে আসিল। ইহার কারণ হইল, ইহাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে নাই।

সুভাষিতম্

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং
মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।।

অর্থ ঃ যিনি যোগের দ্বারা মন শুদ্ধি করান, ব্যাকরণের দ্বারা বচন শুদ্ধ করেন এবং বৈদ্যের দ্বারা শরীরের রোগ দূর করেন, আমি সেই মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি পতঞ্জলিকে প্রণাম করি।

১২৫ বছরের 'হিন্দু বিরোধিতা'কে এবার রাজ্য থেকে উপড়ে ফেলে দিতে হবে

'নয় এ মধুর খেলা'

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

১২৫ বছরের সাহেবি, নেহরুগিরি, বামমার্গী ও উঞ্ছমূলি মানসিকতার শিকার বঙ্গপ্রদেশ। প্রতিটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল যেনতেন প্রকার হিন্দু বিরোধিতাকে সামনে রেখে। ১৯৪৭-এর ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ভারতের বুকে এক খণ্ড হোমল্যান্ড পায় হিন্দু বাঙ্গালি। ১৯৪৭-এর পর সাত দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের বুকে হিন্দুদের ক্রুশবিদ্ধ করাই ছিল সাহেবি, নেহরুগিরি, বামমার্গী ও উঞ্ছমূলি মানসিকতার ধ্বজাধারীদের প্রধান কাজ। ২০২৬-এর ৪ মে ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ জয়ের মধ্যে দিয়ে তার অবসান ঘটে। ১৯৪৭-এর পরবর্তী প্রায় সাত দশক তা পাশ্চাত্যধর্মী জাতীয়তাবাদ আর বিদেশি বামপন্থীদের করায়ত্ত ছিল। তার সঙ্গে ১৫ বছর ধরে যুক্ত হয়েছিল বিষাক্ত উঞ্ছমূল দল। এবার সেই থেকে যাওয়া ক্ষত সারিয়ে ফেলার সময় এসেছে।

ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যাবে ১২৫ বছর ধরে বঙ্গভূমির উপর দিয়ে কীভাবে সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদী অত্যাচারের ঝড় বয়ে গিয়েছে। সমগ্র এশিয়াতে হয়তো বঙ্গপ্রদেশই একমাত্র জায়গা যার উপর দিয়ে নজিরবিহীনভাবে উপনিবেশবাদী সাংস্কৃতিক অত্যাচার আর ধ্বংসলীলা চলেছে। যা কিছু 'হিন্দু' তাই ব্রাত্য। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হলেও কোনো সময়ই তা শাসকের ভাষা বা শাসনের রূপ নেয়নি। ফলে মানুষ তা সহজেই ভুলে গেল। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক শক্তির সরকার তৈরি হওয়ায় সেই বঞ্চনার ইতিহাসকে পরিশোধের সময় এসেছে। দেশ, জাতি ও হিন্দুসমাজ-বিরোধীদের চিহ্নিত করে তাদের চির- নির্বাসন দিতে হবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—'হবার যেটা সেটাই হবে। রবার যেটা সেটাই রবে।' হলোও তাই। পূর্ববর্তী সরকারের পতন ঘটল এবং পূর্বতন শাসক দলের গ্যাং ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এরপর তারা অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। এক ভোট কুশলীর কথায় বিজেপি থাকতে এসেছে, যেতে নয়। সে ভবিষ্যদ্বাণী মিলেছে। আগের দুষ্কৃতী গ্যাঙের সরকার তাদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভাবতে পারেনি। ক্ষমতা হারাবার আগে বিদেশি বামেরা এরকম মোহগ্রস্ত ছিল। বিগত সাত দশকে তিন ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেখেছে রাজ্যবাসী। স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে প্রথম ২৭ বছরে পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেস কর্তৃত্ববাদী সরকার চালিয়েছিল। মানুষ তাদের 'কংগ্রেস মাতব্বর পার্টি' বলত। পাশ্চাত্যধর্মী জাতীয়তাবাদীদের সরকার চলত দু'জায়গায়— কেন্দ্র ও রাজ্যে। পরের ৩৪ বছর সিপিএম-তাড়িত বিদেশি বাম আমলে কেবল রাজনৈতিক সন্ত্রাস আর অত্যাচারের রাজনীতি চলত। দলের নামে লাল সন্ত্রাস চালিয়ে মানুষকে হত্যা করা হতো। বাড়ি, দোকানঘর, ধানের গোলা, গোয়ালঘরে আগুন লাগানো হতো। পুকুরে ফলিডলের বিষ ঢেলে দেওয়া হতো। 'গুপ্ত মিটিং' বা কিম্ভূতকিমাকার গোপন বৈঠক করে হাত দিয়ে মানুষের মাথা কাটা হতো। তারা দলীয় হিংসার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিল। এখন তাদের 'জব্দ দল' বলা হয়। ২০২১ ও ২০২৬-এর ভোটে বিদেশি সিপিএমের ৯১ ও ৯৪ শতাংশ প্রার্থীর জমানত জব্দ হয়। সেই সময় রাজনৈতিক বিকল্প না থাকায় তিন দলকে মানুষ বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছিল।

২০২৬-এর ঐতিহাসিক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ৯৩ শতাংশ ভোটদান তারই বহিঃপ্রকাশ। ২০২৬-এ ভারতীয় জনতা পার্টির জয়ের ভিতর দিয়েই ১৯৪৭-এ ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গকে 'বাঙ্গালি হিন্দুর মাতৃভূমি' রূপে গড়ে তোলার যে লড়াই শুরু হয়েছিল— তা নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা পেল। এবারের ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস', ২১ জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' এবং ২৩ জুন 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বলিদান দিবস' এরাজ্যে পূর্ণ মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হলো। বিদেশি আর কুদেশি সংস্কৃতির ধাক্কায় ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তা হারিয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রবাদী ভাবনা-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকেও এবার বঙ্গীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে এগিয়ে আসতে হবে। তাই 'জিতে গেছি' বলে বসে থাকার সময় এটা নয়। আত্মতুষ্টির সময় এটা নয়। আগামী কয়েক দশকের লড়াইয়ে প্রতিজ্ঞা নিয়েই বিজেপিকে এগোতে হবে।

১২৫ বছর ধরে যে স্বপ্ন অধরা ছিল এখন তা বাস্তবায়নের সময় এসেছে। তা পূর্ণ করতে যদি আরও কয়েক দশক সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হয়, তবে সেটাই করতে হবে। বিগত সাত দশকের তিন প্রশাসকের থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যতিক্রমী হবে। বেআইনি অনুপ্রবেশ ও মুসলমান তোষণকে সমস্যা হিসেবে এরাজ্যে কোনোদিন আমল দেওয়া হয়নি। এবার তা দেওয়া হচ্ছে। চারটি রাজ্যকে (হিমাচল প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক ও কেরলম্) বাদ রাখলে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রথম শক্তির উপস্থিতি ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। বিদেশি বামপন্থী আর দুষ্কৃতী গ্যাং দল লুপ্তপ্রায় প্রজাতি। ওদের বাদ দিলে করণীয় যা থাকে তা হলো এরাজ্যের বুকে রাষ্ট্রবাদী নীতি-সহ ভারতীয় ও বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক আদর্শকে তুলে ধরা। রাজনৈতিক ভাবে লুপ্তপ্রায় হলেও প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরে পাশ্চাত্যবাদী ও বামমার্গীদের উপস্থিতির কারণে তা মোটেই সহজ নয়। খুব কঠিন কাজ। এ এক সাংস্কৃতিক সংগ্রাম! মরণখেলা— নিশীথবেলা।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

চলুন দিদি, রাজ্য বাজেটের নিন্দা করি

নিন্দুকেষু দিদি,

নতুন সরকারের প্রথম বাজেট হয়ে গেল আর আপনি কোনো মন্তব্য করলেন না! আমায় খুব বিস্মিত করেছে দিদি। জানি, একই দিনে আপনার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠরা মিলে আপনাকেই দল থেকে অপসারিত করেছে। এটা কেমন হলো দিদি! আপনি দেখেছেন, পুলিশ আর ক্ষমতা না থাকলে আপনি একেবারে ফেলনা। আমি তো আগেই বলেছিলাম, সবাইকে এত প্রশিক্ষণ দেবেন না। আপনার থেকে এরাও বিশ্বাসঘাতকতা শিখে নিয়ে একেবারে ফ্র্যাঙ্কেস্টাইনের মতো আপনার পিঠেই...।

থাক, আপনার ক্ষত খুঁচিয়ে কষ্ট দেব না। তার চেয়ে বরং, আসুন না একদিন বড়ো সভা করে রাজ্য বাজেটের নিন্দা করি! এটা একটা বাজেট হলো! কোনো ক্ষেত্রকেই বাদ দেওয়া হলো না! কোন কালে এটা হয়েছে দিদি! এই রাজ্যের সরকারি কর্মীরা কোন কালে ভেবেছিল এমনটা হতে পারে। এই রাজ্যের জনগণ কখনো ভেবেছিল একটা দল ভোটের আগে যা যা কথা দিয়েছিল তার সবটা করার ঘোষণা করে দিল একেবারে বাজেটেই। এতে তো এই রাজ্যের মানুষের, সরকারি কর্মীদের মানে সব্বার বদভ্যাস তৈরি হয়ে গেল দিদি। এত পেয়ে গেলে তো আরও পেতে চাইবে। সেই যে আপনি বলেছিলেন, 'যত পাও তত চাও। আশ আর মেটে না।'

তবে দিদি, রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে যা যা বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে তার সবটা যদি হয়ে যায় তা হলে আমাদের রাজ্যকে আর আটকে রাখা যাবে না। অনেক দূরের কথা ভেবেই কিন্তু এই বাজেট। আমি একটা তালিকা বানিয়েছি। কী কী করতে চায় রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে। আপনি একটু পড়ে দেখবেন দিদি। আপনি ১৫ বছর সময় পেয়েছিলেন। চাইলে কিন্তু করতেই পারতেন। কিন্তু আমার কথা না শুনে ১৫ বছর মানে ৩৬৫ দিয়ে গুণ করলে ৬,৪৭৫ দিন শুধুই রাজনীতি করেছেন আর মিথ্যে বলেছেন আর আপনার ভাই ভাইপোরা চুরি ও জোচ্চুরি।

তালিকাটা দেখুন দিদি

১. তিনটি নতুন বিমানবন্দর— পুরুলিয়া, বালুরঘাট ও মালদহে। কোচবিহার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ।

২. কলকাতা বিমানবন্দরের উপর চাপ কমাতে কল্যাণীতে তৈরি হবে 'গ্রিনফিল্ড' বিমানবন্দর।

৩. নিউটাউন ও মধ্য কলকাতার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী এলিভেটেড করিডোর নির্মাণ।

৪. 'মাল্টিমোডাল লজিস্টিক হাব' হিসেবে গড়ে তোলা হবে ডানকুনিকে।

> এই সব কাজের জন্যই তো 'বাংলা নিজের মেয়ে'কে চেয়েছিল। কিন্তু সেই মেয়েটা 'বাংলা'কে এমন ডোবাবে কেউ চায়নি, কেউ ভাবেনি। আপনি নিজেও যে এভাবে ডুববেন তাই-বা কে জানত!

৫. রাজ্যের ২০টি জায়গায় রেলের সহায়তায় রেল ওভারব্রিজ বানাবে রাজ্য।

৬. ভাগীরথীর উপরে, কালনা ও শান্তিপুরের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ।

৭. হলদিয়া ও নন্দীগ্রামের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সেতু তৈরি করতে ১০০ কোটি বরাদ্দ।

৮. কলকাতায় যানজট এড়াতে শালিমার ও গার্ডেনরিচের মধ্যবর্তী অঞ্চলে টার্মিনাল নির্মাণ।

৯. রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নতুন তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার পরিকল্পনা।

১০. ডানকুনি ও মগরাকে জুড়তে রোড করিডর তৈরি করার পরিকল্পনা।

এছাড়াও কৃষি থেকে শিক্ষা, শিল্প থেকে বিদ্যুৎ সবেতে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে দিদি, সেটা হলে তাও রাজ্যের পরিকাঠামো বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নয়নের দিশা দেখাবে। এগুলো কিন্তু আপনিও করতে পারতেন। এই কাজগুলো হলেই তো বিনিয়োগ আসবে, বড়ো শিল্প আসবে। কর্মসংস্থান হবে।

এই সব কাজের জন্যই তো 'বাংলা নিজের মেয়ে'কে চেয়েছিল। কিন্তু সেই মেয়েটা 'বাংলা'কে এমন ডোবাবে কেউ চায়নি, কেউ ভাবেনি। আপনি নিজেও যে এভাবে ডুববেন তাই-বা কে জানত! আপনি সবাইকে ঠকিয়ে নিজে কেমন একঘরে হয়ে গেছেন তা আরও টের পাবেন।

আমিও তো ভাবছি আপনাকে সপ্তাহে সপ্তাহে আর চিঠি লিখে সহানুভূতি দেখাব না। জানি সম্ভব নয়, তবু চাইছি, ভালো থাকবেন। ▫

অতিথি কলম

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফলাফল সমগ্র দেশকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেছে

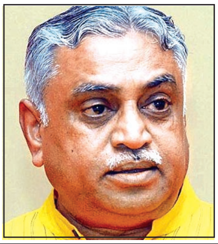

ড. মনমোহন বৈদ্য

ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ এই প্রতিবেদকের পশ্চিমবঙ্গে আসার সুযোগ হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ মানুষ রাজনৈতিক পরিবর্তন চাইলেও, খুব কম লোকজন বিশ্বাস করতেন যে এই পরিবর্তন সত্যিই সম্ভব হবে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে পরিবর্তনকে অলৌকিকের চেয়ে কম কিছু মনে হচ্ছিল না। সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত ও নির্ভয় পরিবেশ তৈরি করাই ছিল সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। তবে নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবার উৎসাহের সঙ্গে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এরাজ্যের আগের পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনে (২০০১, ২০০৬, ২০১১, ২০১৬ ও ২০২১) গড় ভোট দান ছিল ৭৯.২২ শতাংশ। ২০২৬ সালে তা বেড়ে হয়েছে— ৯২.৪৭ শতাংশ। প্রায় ১৩ শতাংশ এই আকস্মিক বৃদ্ধিতে এসআইআর-এর অবদান অস্বীকার করা যায় না। তবে, এই বৃদ্ধি ভোটদানের জন্য নির্ভীক পরিবেশ এবং অভূতপূর্ব জনউচ্ছ্বাসকেও প্রতিফলিত করে। এই নির্বাচনকে সমাজ রক্ষার লড়াই বা একটি 'সভ্যতার সংগ্রাম' হিসেবে দেখা-সহ নিরাপত্তা বাহিনীর যথাযথ ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে জনগণের আস্থা— এগুলোও এমন কিছু বিষয় যা উপেক্ষা করা যায় না।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এক প্রবীণ মহিলা সাংবাদিকের দেখা হয়, যিনি একজন কট্টর বামপন্থী। গত ২৯ মে তাঁর সঙ্গে আবার কথা হলো। তিনি জানালেন যে, তিনি প্রথম ভোট দিয়েছিলেন ১৮ বছর বয়সে এবং তারপর ২০২৬ সালে আবার ভোট দেন। তাঁর বয়স এখন ৪৬ বছর। পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং পরিবর্তন সম্ভব— এই বিশ্বাসই ছিল তাঁর ভোট দেওয়ার প্রধান প্রেরণা। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে হিংসার ইতিহাস রয়েছে। এবারের নির্বাচনটি তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল, যার কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর। একারণেই মানুষ নির্ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভোট দিয়েছেন। এই নির্বাচন শুধু বিজেপির বিজয় ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং হিন্দুত্বের বিজয় নিশ্চিত করেছেন। মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আত্মা পুনর্জাগরিত হয়েছে। এ হলো বঙ্গীয় চেতনার বিজয়; শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং বিপিনচন্দ্র পালের মতো আধ্যাত্মিক ও জাতীয় জাগরণের পথিকৃৎ মহান ব্যক্তিত্বদের বিজয়।

এই মুহূর্তটি আমাদের ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকারের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই সময়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ঘোষণা বঙ্গে এক অদম্য শক্তি, অভূতপূর্ব ঐক্য এবং জাতীয় চেতনার উদয় ঘটিয়েছিল। সেই জাগরণের বিস্ফোরণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে তা ব্রিটিশ-ভারত সরকারকে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, ১৯১২ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকারকে তাদের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং হিন্দুত্বের বিজয়কে পশ্চিমবঙ্গের 'বন্দে মাতরম্ মুহূর্ত' বলা যেতে পারে।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ফলাফল ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বঙ্গপ্রদেশে সংঘটিত জনজাগরণ, সংকল্প, জাতীয় চেতনা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে।

'বন্দে মাতরম্' গানটি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ সালে তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের জন্য রচনা করেছিলেন। এটি প্রথম গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে। পরবর্তীকালে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশদের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বঙ্গের মানুষ 'বন্দে মাতরম্'-কে স্বাধীনতা আন্দোলনের রণধ্বনি হিসেবে গ্রহণ করে। প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত প্রতিবাদে জেগে ওঠে। লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল (লাল-বাল-পাল) সকলেই জাতীয় স্তরের নেতা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি জনগণের অন্তরে অদম্য শক্তি ও রাষ্ট্রচেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। বহু বিপ্লবী 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে হাসিমুখে ফাঁসির দড়িকে চুম্বন করে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ব্রিটিশদের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় 'বন্দে মাতরম্' এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর, রবিবার, কলকাতায় উদ্‌যাপিত 'রক্ষাবন্ধন' উৎসবটি ছিল ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত, এই উৎসবটি আগস্ট মাসের শ্রাবণী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে, ১৬ অক্টোবর কলকাতায় আপামর বাঙ্গালি সমাজ পরস্পরকে রাখি পরিয়ে 'রাখিবন্ধন' উদ্‌যাপন করে এবং এই রেশমি সুতোর বন্ধনের মতো সমগ্র বঙ্গকে ঐক্যবদ্ধ রাখার এবং এর বিভাজন হতে না দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করে। তখনই শ্রীঅরবিন্দ

সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম্'-কে স্বাধীনতার মন্ত্র বলে অভিহিত করেন। জাতীয় চেতনা জাগরণের জন্য শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৭ সালে মাদাম ভিকাজি কামা জার্মানিতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন, যেটিতে 'বন্দে মাতরম্' লেখা ছিল। তখন থেকেই 'বন্দে মাতরম্' স্বাধীনতার মন্ত্র, দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় গান এবং বিপ্লবীদের বিপ্লব-চেতনায় পরিণত হয়েছে।

'বন্দে মাতরম্'-এর দ্বারা প্রজ্বলিত বিপ্লবী উদ্দীপনায় শঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ-ভারত সরকার ১৯০৬ সালের এপ্রিলে প্রকাশ্যে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া নিষিদ্ধ করে। কিন্তু এই দমনপীড়ন বঙ্গে এক অদম্য উৎসাহ ও শক্তির জন্ম দেয়, যা শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ-ভারত সরকারকে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। এই শক্তি ও উদ্দীপনা শুধু বঙ্গপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই জাগরণের শিখা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নাগপুরে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন প্রকাশ্যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে স্কুল প্রশাসনের রোষানলে পড়েন। এর ফলে তাঁকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেই থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া শুরু হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরুর অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরানী, পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর এবং ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের মতো প্রখ্যাত গায়কেরা এতে কণ্ঠ দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কংগ্রেসের সকল সদস্য স্বাধীনতা আন্দোলনের জীবনীমন্ত্র হিসেবে এটি গেয়েছেন। তবে, ১৯২১ সালের পর, ব্রিটিশদের বিভাজনমূলক রাজনীতির প্রভাবে কংগ্রেসের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এর ফলে, তুরস্কে খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করা এবং 'বন্দে মাতরম্'-কে সাম্প্রদায়িক বলে বিরোধিতা করার মতো প্রবণতা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দেখা দিতে শুরু করে। যে গানটি ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো, ১৯২৩ সালের পর থেকে সেটিকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে আখ্যা দেওয়া শুরু হয়। এখানেই ভারত বিভাজনের বীজ রোপিত হয়েছিল।

ভারতীয় চিন্তাধারায় মানুষকে কেবল একটি দেহ হিসেবে নয়, বরং দেহ, আত্মা, মন, বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে গঠিত একটি পঞ্চবিধ সত্তা হিসেবে দেখা হয়। একইভাবে, 'বন্দে মাতরম্' ভারতবর্ষের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে। এর প্রথম স্তবকে ভারত ভূখণ্ডের বর্ণনা, দ্বিতীয় স্তবকে ভারতের জনগণকে চিত্রিত করা হয়েছে এবং পরবর্তী স্তবকগুলিতে ভারতের মন, বুদ্ধি, আত্মা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

'তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম'— এখানে 'বিদ্যা' হলো ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যা মোক্ষের পথ প্রদর্শন করে। 'আমি'-কে সংকুচিত করে 'আমরা'-র বোধকে প্রসারিত করা এবং আপনত্বের অনুভূতি নিয়ে সমাজকে কিছু দেওয়া, অর্থাৎ সমাজকে প্রতিদান দেওয়া, এটাই— 'ধর্ম'; এখানে 'ধর্ম' বলতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' বোঝানো হয় না। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন যে, যে সমাজে মানুষ তাঁদের শ্রমের ফল নিজের জন্য না রেখে সমাজকে দান করে, সেই সঞ্চিত সামাজিক পুঁজির জোরে সমগ্র সমাজ সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং সেই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিও সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী হয়। এটাই 'ধর্ম'। সুতরাং, এক অর্থে সমাজের এই সামাজিক পুঁজিকে সমৃদ্ধ করাই 'ধর্ম'। সেই কারণেই, স্বাধীনতার পর ভারতের নেতৃত্ব বিচক্ষণতার সঙ্গে লোকসভার জন্য 'ধর্মচক্র প্রবর্তনয়', রাজ্যসভার জন্য 'সত্যং বদ, ধর্মং চর' এবং সুপ্রিম কোর্টের জন্য 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' মূলমন্ত্র এবং জাতীয় পতাকায় ধর্মচক্র গ্রহণ করেছিল। এই জ্ঞান ও ধর্মই ভারত জননীর হৃদয়ে রয়েছে— এটাই ভারতের আত্মা।

ভারতমাতা হলেন শক্তির দেবী দুর্গা, সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী এবং জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর সম্মিলিত রূপ। এটাই ভারতবর্ষ। এই কারণেই, ১৯০৫ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া শুরু হয়। এটি গাইতে প্রায় তিন মিনিট সময় লাগে। স্বদেশবোধ জাগরণের এই মহামন্ত্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কোথায়?

পরবর্তীতে বিভেদ, বিভাজন সৃষ্টিকারী, সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রভাবে এর বিরোধিতা শুরু হয়, যা আজও কোনো না কোনো রূপে অব্যাহত রয়েছে। যারা এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখেন, তারা কেবল ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, রীতি ও পরম্পরা সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন। অথবা, যা মনে হয়, তারা তখন ব্রিটিশ শাসন এবং আজকের ভারত-বিরোধী, বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তির প্রভাবাধীন ছিলেন কিংবা তাদের হাতের পুতুল হয়ে খেলছেন।

কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' ভারতের আত্মাকে নাড়া দিয়েছিল, জাতীয় চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার বোধ প্রজ্বলিত করেছিল। এই কারণেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এমন ব্যাপক জনরোষ সৃষ্টি হয়েছিল যে, ব্রিটিশ-ভারত সরকারকে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হয়। বর্তমান ভারত সরকার 'বন্দে মাতরম্'-কে গুরুত্বদান করেছে এবং সব উৎসব-অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছে। এটি যথাযথ ও প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ফলাফল ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বঙ্গপ্রদেশে সংঘটিত জনজাগরণ, সংকল্প, জাতীয় চেতনা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। এই নির্বাচন ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বাঙ্গলাকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ করেছে। ভারতের অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি-সম্পন্ন 'বাংলাভাষা'র পরিচয় যে ভারতের আধ্যাত্মিক পরিচয় থেকে পৃথক নয়, বরং তারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ— এই নির্বাচনের ফলাফল তা প্রমাণ করেছে।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ও জেহাদি মোল্লাবাদীরা ভারতের জাতীয় পরিচয় ধ্বংস করার জন্য যেমন একজোট হয়েছিল, তেমনই ২০২৬ সালে অবিবেচক সেকুলার রাজনীতিবিদ, জেহাদি উগ্রপন্থী এবং কালচারাল মার্ক্সিস্ট-রা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য একজোট হয়েছিল। ১৯০৫ ও ২০২৬— উভয় সময়েই বাঙ্গালি হিন্দুরা এক অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে— শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'বঙ্গীয় পরিচয়' পুনর্জাগরিত হয়েছে। ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমন্বিত, আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন, অর্থাৎ ভারতের 'হিন্দুত্ব' আবারও স্বমহিমায় আবির্ভূত হয়েছে। এই ফলাফলকে বাস্তব করে তোলা সকল নাগরিক, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং অভূতপূর্ব সংখ্যায় নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার সাহস এবং দৃঢ়সংকল্প প্রদর্শনকারী পশ্চিমবঙ্গের সকল নারী-পুরুষকে আন্তরিক অভিনন্দন। পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র রক্ষার লক্ষ্যে তাঁদের অঙ্গীকার এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাই এই ঐতিহাসিক ফলাফলকে সম্ভব করেছে। নিঃসন্দেহে, এটি পশ্চিমবঙ্গের 'বন্দে মাতরম্ মুহূর্ত'।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য)

বাঙ্গালি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মোবাইল ফোন না দিয়ে তাদের এবার পড়ার টেবিলে পাঠানোর সময় এসেছে

আগামী এক দশকে এরাজ্যে দু'টো বড়ো পরিবর্তন আসতে চলেছে। (১) পূর্ব ভারতের রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ'কে গড়ে তোলার জন্য এরাজ্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। (২) মহারাষ্ট্রের মতো এরাজ্যেও স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ও ট্রেডিং শুরু হচ্ছে। এখন বাঙ্গালিকে পালটাতে হবে বই-খাতার টেবিল। ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্ক ও ফিনান্স শেখাতে হবে অন্য ভাবে। ইকোনমিক্স বা অ্যাকাউন্টেন্সি-র পরিবর্তে 'ফিনান্স'-এর প্রশিক্ষণে জোর দিতে হবে। ব্যবসাবাণিজ্য শুধু নয়, গবেষণা-উদ্ভাবন-ডিজাইন— সবকিছুর জন্য অঙ্ক শেখাটা প্রয়োজন। আর ফিনান্স শেখানো দরকার ক্লাস সিক্স থেকে। আজকের বাঙ্গালির ৯৫ শতাংশ জানে না যে, কত আয় করলে কত ঋণ করা উচিত, কত খরচ করা উচিত, কতটা ব্যাংকে রাখা উচিত, কতটা পিপিএফ, কতটা বন্ড এবং কতটা স্টকে (শেয়ারে) রাখা উচিত। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের 'ভারতীয় ফিনান্সিয়াল সিস্টেম' জানা উচিত। আমেরিকার ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং কিন্তু ভারতীয়দের কাজে লাগবে না। কারণ ভারতীয় সমাজের গঠন আলাদা। আমেরিকায় সব নাগরিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে থাকার কারণে ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় তাদের কোনো খরচ করতে হয় না। তারা ছেলে-মেয়েদের জন্য সম্পত্তিও রেখে যায় না, আবার ছেলে-মেয়েরাও তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে না। ঋণ করে চলে তাদের সারা জীবন। আর ওরা ঋণ দেয় গোটা পৃথিবীকে, কিন্তু সেই সব ঋণ আর শোধ হয় না। ভারতে কিন্তু সেই সুবিধা নেই।

অঙ্ক শেখানোর ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে 'জাতীয় শিক্ষানীতি -২০২০'-র থেকেও একটু এগিয়ে গিয়ে শিক্ষাবিদদের ভাবতে হবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য কিন্তু আলাদা। বঙ্গের অতীত অনেক গৌরবের এবং পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ আবার উজ্জ্বল হতে চলেছে। বর্তমানের অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটবে। একসময় বাঙ্গালি জমিদার ও ব্যবসায়ীরা নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, শ্রীহট্ট থেকে পণ্ডিত এনে নিজেদের গ্রামে ছাত্রদের অঙ্ক শেখাতেন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। আর অঙ্ক শিখে বাঙ্গালিরা বিজ্ঞানকে এমন জায়গায় নিয়ে যায় যে, ১৭৭৬ সালে আমেরিকা একজন বাঙ্গালি— রামদুলাল দে সরকারকে নিয়ে যায় কীভাবে জাহাজ তৈরি করতে হয় সেটা জানতে। 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০'-র প্রস্তাব অনুযায়ী স্কুলে অঙ্কর দু'টো আলাদা সেকশন (বিভাগ) রাখতে হবে। অর্থাৎ ক্লাস সেভেনে দু'টি সেকশনে দুই ধরনের অঙ্ক ক্লাস। ফিনান্সের পঠনপাঠন শুরু করাতে হবে ক্লাস সিক্স থেকে এবং হাই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ব্যাংক, বিমা, মিউচুয়াল ফান্ড ও শেয়ার ব্রোকিং কোম্পানিতে।

অন্য রাজ্য এই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবায়িত না করলেও পশ্চিমবঙ্গকে এটা করতে হবে, কারণ এরাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান আগামী এক দশকে অনেক তাড়াতাড়ি নানা পরিবর্তন আনবে। ভারতের উন্নয়নের মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেবে 'পশ্চিমবঙ্গ'। যদি সেই উন্নয়নযজ্ঞের জন্য এই প্রজন্মের বাঙ্গালি ছেলেমেয়েদের তৈরি করা সম্ভব না হয়, তবে শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, খড়্গপুর ও কলকাতায় অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বড়ো বড়ো তামিল-তেলুগু ও রাজস্থানী বসতি তৈরি হবে। দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করায়ত্ত না থাকলে, প্রবল প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে বাঙ্গালির স্থান হবে শহরের বাইরে। নিউ আলিপুর বা সল্টলেকের মতো বাঙ্গালি কমতে থাকবে এইসব জায়গায়। গত এক মাসে এবং গত ২২ জুন বিধানসভায় পাশ হওয়া রাজ্য বাজেটে পশ্চিমবঙ্গে যে সব বন্দর, বিমানবন্দর, রেল, সড়ক, বিদ্যুৎ, মেট্রো ও গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, আগামীদিনে তা বাস্তবায়িত হলে জিডিপি-র অঙ্কে মহারাষ্ট্রকে ধরতে পশ্চিমবঙ্গর খুব বেশি হলে ৮ বছর লাগবে। আর সেই উন্নয়নের ডিভিডেন্ড উপার্জন করতে হলে 'স্টেক হোল্ডার' হতে হবে, কর্মচারী নয়। উন্নয়নের অংশীদার বা স্টেক হোল্ডার হতে হলে ন্যূনতমভাবে অঙ্ক ও ফিনান্স জানা দরকার। কালীঘাটের ব্যানার্জি বা বিশ্বাস ভাইদের ফর্মুলায় কিন্তু অর্থবান আর হওয়া যাবে না।

১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও দেশের অর্থনীতিকে স্বাধীন করলেন। তার তিন বছরের মধ্যে টিসিএস, ইনফোসিস ভারতে তাদের কাজ বাড়ালো এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নেওয়া শুরু করল। কয়েক বছর পর কম্পিউটার শেখাতে বাজারে এল GNIIT, DOEACC, Aptech, CMC, Brainware। সায়েন্স-আর্টস্-কমার্সের স্নাতকরাও এই ইনস্টিটিউটগুলি থেকে ট্রেনিং নিয়ে জীবনে সফল হন পরের দুই দশকে। তাঁদের দেওয়া আয়কর-সহ অন্যান্য করের অর্থে দেশে তৈরি হয় পরিকাঠামো ও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু 'কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সিটি' তৈরি করছেন। খড়্গপুরে কলাইকুণ্ডা ও পশ্চিম বর্ধমানে অণ্ডাল বিমানবন্দর যদি চালু হয় এবং গত এক মাসে এরাজ্যের জন্য যে বন্দর ও রেল প্রকল্পগুলি ঘোষিত হয়েছে, তা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে খড়্গপুর ও দুর্গাপুর কিন্তু আগামীদিনে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং শহর হতে চলেছে। এর সঙ্গে আগামী ৮ বছরে ট্রেডিং বাড়বে কম করে পাঁচ গুণ। কারণ পূর্ব, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ভারত এই পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হবে। এমতাবস্থায় অঙ্ক ও ফিনান্স শেখা খুবই জরুরি। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সব স্তরে প্রয়াস করতে হবে। এক কালে বাঙ্গালি যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজ— দুই-ই নির্মাণে পারদর্শী ছিল। তাই আকবর ভাগীরথী ও ইছামতীতে জলযুদ্ধে হারাতে পারেনি বাঙ্গালি বারো ভূঁইয়াদের। ১৭৭৬-এ রামদুলাল দে সরকার আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকানদের জাহাজ বানানো শেখান। এছাড়া মেটালার্জি (ধাতুবিদ্যা), টেক্সটাইল (বয়নশিল্প) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অঙ্কের ব্যবহার ছিল। মুঘল আমলে সমগ্র এশিয়ার ব্যাংকিং হাব ছিল মুর্শিদাবাদ। ব্রিটিশ আসার আগে পর্যন্ত পৃথিবীর ব্যবসাবাণিজ্য-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছিল এই বঙ্গভূমি। আগামী কয়েক বছর বাঙ্গালি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে না দিয়ে অভিভাবকরা যদি তাঁদের পড়াশোনার ওপর জোর দিতে পারেন, তাহলে চিন্তা নেই। তা না হলে অন্যান্য রাজ্যের যোগ্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এরাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা এঁটে উঠতে পারবে না। ▯

পশ্চিম-বাংলাদেশ হওয়া থেকে বেঁচে গেল পশ্চিমবঙ্গ

অমিত কুমার চৌধুরী

এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস হেরেছে এবং বিজেপি জিতেছে। বিজেপির এই জয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালি এ যাত্রায় বেঁচে গেল। বাঙ্গালির সংস্কৃতি, হিন্দুজাতি তথা হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষা পেল। জেহাদি শক্তি ও তাদের তোষণকারী সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলির ঘৃণ্য প্রয়াস সত্ত্বেও 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যটি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি কিংবা বাংলাদেশের সঙ্গে মিশে যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ যে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হতে পারে— এ কথা শুনে অনেকের হয়তো পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তা কখনো সম্ভব নাকি? এসব নিতান্তই অবাস্তব কথাবার্তা! এটা ঠিক যে, স্বপ্ন বিলাসী না হয়ে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনের সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশও বিভাগ হয়ে যায়। মহম্মদ আলি জিন্না সমগ্র বঙ্গ ও অসম চেয়েছিল পাকিস্তানের মধ্যে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অসম তো পেলই না, এমনকী বঙ্গের কলকাতা শহর-সহ পশ্চিমবঙ্গ তার অধরাই থেকে যায়। কলকাতা না পাওয়ার দুঃখ নিয়ে জিন্না বলেছিলেন— আমি পোকা খাওয়া পাকিস্তান পেলাম। আর অসম সম্পর্কে বলেছিলেন— পরবর্তীতে আমি রুপোর থালায় তোমাদের অসম উপহার দেবো। দেশভাগের পর তিনি ভারত ভূখণ্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের পাকিস্তানে না এসে ভারতেই থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন যে, আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে তোমরা সেখানে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। হয়েও ছিল তাই। সত্তরের দশক থেকে মুসলমানরা ভারতের রাজনীতিতে বেশ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল।

প্রথমে অসমের কথায় আসি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে একদিকে বিপুল পরিমাণ মুসলমান জনতাকে সুপরিকল্পিতভাবে অসমে অনুপ্রবেশ করানো হয়, আর অন্য দিকে অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানোর ফলে অসমের এক বিশাল অঞ্চল মুসলমানদের কবলে চলে যায়। ফলে আজ অসমে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। যদিও মুসলমানদের বসবাস অসমের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের এক মুসলমান নেতা বলেছিলেন— 'আমাদের দেশে জনসংখ্যা প্রচুর। দরিদ্র মুসলমান শ্রমিকদের আমরা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পাঠিয়ে তা দখল করে নেব।' কিন্তু হিমন্ত বিশ্বশর্মার মতো প্রখর জাতীয়তাবাদী নেতা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ফলে মুসলমান আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে অসম।

এবার পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে হিন্দু নিধন ও বিতাড়ন চলতেই থাকে। বিশাল সংখ্যক হিন্দু জনতা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার কারণ দু'টি। প্রথমত, হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের জন্মহার অনেক বেশি এবং দ্বিতীয় কারণ— বাংলাদেশ থেকে মুসলমানদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ। ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ। তাই জিন্নার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমানবহুল করে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করে এক 'অখণ্ড ইসলামি বাংলা' গড়ার কাজ চলছে খুব পরিকল্পিত ভাবে যা বাঙ্গালিদের মধ্যে অনেকেই বুঝতে অক্ষম। শুধু তাই নয় বঙ্গ, বিহার, ওড়িশা নিয়ে যে বঙ্গপ্রদেশ ছিল মুঘল শাসনে — তার স্বপ্নও অনেক মুসলমান এখনও মনে মনে পোষণ করে।

বাংলাদেশে গত জুলাই জেহাদি জনতার মিছিল থেকে ধ্বনি উঠেছিল আমরা চার ঘণ্টায় কলকাতা দখল করে নেবো। আরেক মুসলমান মৌলবি বলেছিলেন আমার এগারোটা সন্তান, আপনারা যত পারেন সন্তান জন্ম দিন। ওরা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে, আমরা জনবিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইউরোপ দখল করে নেবো। গণতন্ত্রে সংখ্যাটা একটি ফ্যাক্টর। বাংলাদেশের আরেক মুসলমান নেতা বলেছিলেন, মুসলমানরা পৃথিবীর যেকোনো দেশে চলে গিয়ে মজহবকে ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে, ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে সেই দেশটাকে দখলের চেষ্টা করে। আরেক মুসলমান নেতা বললেন— 'যেখানে একজনও মুসলমান থাকবে, সেখানেই আমরা শরিয়তি শাসন কায়েম করব।' অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস— একদিন সারা বিশ্বে ইসলাম কায়েম হবে, সমগ্র বিশ্ব ইসলামের পতাকাতলে আসবে। সেই বিশ্বাসের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকেও গ্রাস করবে এই জেহাদিরা— এই আশঙ্কা হিন্দুরা করলে কি তা অমূলক হবে? সেই প্রচেষ্টাই চলছে দুই বঙ্গে।

বাংলাদেশে হিন্দুরা বস্তুত দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। নেহাত বিশ্বের চাপ আছে তাই যেটুকু হিন্দু বেঁচে আছে তাও থাকতো না। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৩০-৩৫ শতাংশ। সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে আজ ৫-৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর ১০-২০ বছর পর হিন্দুশূন্য হবে বাংলাদেশ। অতীতের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু বর্তমানের ঘটনাগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালেই বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিটা বোঝা যাবে। হিন্দুদের জমি দখল, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, হিন্দু নারীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা, প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে অথবা বলপূর্বক হিন্দু মেয়েদের বিবাহ করা, হিন্দুদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকান লুঠ, তাঁদের থেকে জোর করে বড়ো অঙ্কের চাঁদা আদায়, হিন্দুদের কোনো বড়ো সরকারি পদে বসতে না দেওয়া, হিন্দুদের বাড়ি বা মন্দিরের সামনে এসে প্রকাশ্যে গোহত্যা ইত্যাদি চলতেই থাকে। সম্প্রতি

ফঃ ২

বাংলাদেশের এক মুসলমান নেতা বলেছে যে, বেশি পূজা করার ইচ্ছে হলে ভারতে চলে যাও। আরেক মুসলমান মহিলা হিন্দুদের হুমকি দিয়েছে যে, পূজা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ১৯৪৬ সালের মতো নোয়াখালী করে ছাড়বো। দুর্গাপূজার মণ্ডপে এসে আজানের সময়সূচি টাঙিয়ে দিয়ে বলছে আজানের সময় কোনো মাইক, ঘণ্টা বাজানো যাবে না। মিথ্যা অভিযোগে ফেক আইডি তৈরি করে ফেসবুকে ইসলাম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে হিন্দু হত্যা হামেশাই হচ্ছে। দীপু দাসকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা তার সাম্প্রতিক নিদর্শন। জেহাদিদের দ্বারা প্রকাশ্যে মিছিল করে বলা হচ্ছে হিন্দুদের পূজা করতে দেওয়া হবে না। আমাদের নবিই মূর্তি ভেঙেছে তাই আমরা মূর্তি গড়ি না,ভাঙি। চিন্ময় প্রভুর মতো নিরীহ হিন্দু সন্ন্যাসীকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা অভিযোগে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ২০২৪ সালের জেহাদি অভ্যুত্থানের সময় একাত্তরের সব স্মৃতি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙে এই জেহাদিরা দেশটাকে আফগানিস্তান বানিয়ে ফেলেছে।

দেশভাগের সময় মুসলমান-অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদকে ভারতে রাখার জন্য মুর্শিদাবাদের থেকেও বড়ো জেলা--- হিন্দুপ্রধান খুলনাকে ছেড়ে দিতে হয়। সিলেট হিন্দুপ্রধান জেলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলগুলিকে ভারতে রাখতে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ ও নদীয়া জেলার মুসলমান-প্রধান অংশগুলি পাকিস্তান ছিনিয়ে নেয়। অথচ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর জেলায় প্রচুর হিন্দু থাকা সত্ত্বেও তার কোনো অংশ ভারত পায়নি। মুসলমানদের সমগ্র বঙ্গ দখলের স্বপ্ন নিয়ে এখনোও ভারতের সেকুলার রাজনৈতিক দলের মুসলমান নেতারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে কাজ করে চলেছে।

ওপারের সেই আগ্রাসী মনোভাবের ছোঁয়া পশ্চিমবঙ্গেও লেগেছিল মমতা ব্যানার্জির টিএমসির কল্যাণে। এরাজ্যে একটা বাংলাদেশি ও মুসলমান লবি খুব সক্রিয়। বস্তুত তৃণমূলনেত্রীকে চালায় সেই মুসলমান লবি। মুসলমানরা তো বারবার বলছেই— 'আমরাই ঠিক করবো এখানে কে সরকার গঠন করবে।' ওপার বঙ্গের হিন্দু নির্যাতন নিয়ে এপারের সেকু-মাকু হিন্দুর কোনো হেলদোল নেই। তারা সকলেই মুসলমানদের তুষ্ট করতেই ব্যস্ত। হিন্দুর হয়ে কথা বললেই 'সাম্প্রদায়িক' হিসেবে দাগিয়ে দেয় এই সেকুলার, বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহীদের দল। কলকাতার পূর্বতন মেয়র ফিরহাদ হাকিম প্রকাশ্যে মুসলমানবহুল এলাকাকে 'মিনি পাকিস্তান' বলছেন। হিন্দু হয়ে জন্মানো দুর্ভাগ্য, হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের বেশি মানুষ একদিন বাংলা ছেড়ে উর্দু বলবে— এসব কথা তিনি অনবরত বলে চলেছেন। হুমায়ুন কবির হিন্দুদের কেটে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন, ভারত-আক্রমণকারী বাবরের নামে মসজিদ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন। হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পাথর মারা হচ্ছে, তুলসী বেদী জেহাদিরা ভাঙছে। উর্দুভাষী মুসলমানরা দুর্গামণ্ডপে এসে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা বাজাতে বাধা দিচ্ছে। মুর্শিদাবাদে দুর্গা মণ্ডপে আজানের সময়সূচি টাঙিয়ে বলছে আজানের সময় যেন কোনো আওয়াজ না হয়। কলকাতার কিছু জায়গায় দুর্গাপূজার মণ্ডপে আজানের সুর বাজানো হচ্ছে। টিএমসির সায়নী ঘোষ শিবলিঙ্গে আপত্তিকর কিছু পরাচ্ছেন। কবি শ্রীজাত ত্রিশূলেও ওই জিনিস পরিয়ে কবিতা লিখছেন। সিপিএমের বিকাশবাবু প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ করছেন, কুম্ভমেলাকে অন্ধ কুসংস্কার বলছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কুম্ভকে মৃত্যু কুম্ভ বলেছিলেন। গত ১৫ বছর ধরে এরাজ্যের স্কুলগুলিতে সরস্বতী পূজা বন্ধ করা হয়েছে। এক মুসলমান পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করেছিল হিন্দুদের কাছে কালীপূজা করার জন্য— যেন ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব! মুসলমান এলাকায় হিন্দু শোভাযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। একই দিনে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং মুসলমানদের মজহবি পরব পড়লে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হিন্দুদের অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হতো না। প্রতিবার অসহায় হিন্দুদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হতো। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাস্তা বন্ধ করে নমাজ পড়া চলত। সিএএ-এনআরসি-ওয়াকফ আন্দোলনের নামে হিংসাশ্রয়ী তাণ্ডব করে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। কালিয়াচক, মোথাবাড়ি, বেলডাঙ্গা, ভাঙড়, একবালপুর প্রভৃতি স্থানের ঘটনা মনে করতে হবে সবাইকে। বিভিন্ন অজুহাতে সর্বত্র হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানঘর ভাঙা হয়েছে। হিন্দু মা-বোনেদের বলাৎকারের হুমকি দেওয়া হয়েছে। হিন্দুরা প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে হত্যা করেছে জেহাদিরা। সেই গ্রামের হিন্দুরা মালদায় পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলে তৎকালীন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন— কী এমন হয়েছে একটা জেলা থেকে তো অন্য জেলায় গেছে। কিন্তু এ তো ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় উদ্বাস্তু হওয়া নয়; ২০২৫ সালে নিজের দেশেই উদ্বাস্তু হওয়া! দীর্ঘ বহু দশক ধরে এরাজ্যে সেকুলার রাজনৈতিক শক্তির শাসন বলবৎ থাকার ফলে, শাসক দলের রক্তচক্ষু এড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে না ওঠার কারণে জেহাদি শক্তি সরকারি মদতে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রতিটা জেলায় শেখ শাজাহান, জাহাঙ্গির, বাবর, কাইজার, মুদাস্‌সর, সেলিম, আরাবুল, শওকতদের মতো ঘাতক, লুটেরা, সন্ত্রাসবাদী, ধর্ষণকারীরা শাসক দলের মদতে ছোটো ছোটো মিনি পাকিস্তান তৈরি করে ফেলেছে। তাই হিন্দুদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছিল। ২০২৫-২৬ সালে হিন্দুদের মধ্যে এক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল— বাঁচতে গেলে এবং আবার উদ্বাস্তু না হতে চাইলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভোট দিয়ে এই হিন্দুবিরোধী তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে হবে। বিশিষ্ট চিকিৎসক, একদা বামপন্থী ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন— 'বিজেপিকে এবার ভোট দিলে এখন আমাকে সাম্প্রদায়িক বলবে, কিন্তু না দিলে পরে উদ্বাস্তু বলবে।' তাই ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়যুক্ত হওয়ায় এরাজ্য পশ্চিম-বাংলাদেশ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। বাঙ্গালি হিন্দু ও বঙ্গীয় সংস্কৃতি রক্ষা পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বারো বছরের পথচলা

অর্জন, রূপান্তর ও নতুন ভারতের অভিযাত্রা

দেশের কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রম ও অংশগ্রহণে নির্মিত এই যাত্রাপথের বারো বছর পূর্তিতে রাজধানী দিল্লি যেন সত্যিই পরিণত হয়েছিল এক 'চাঁদের হাটে'।

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে গত বারো বছর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমন এক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যাত্রার সূচনা করেন, যার লক্ষ্য ছিল উন্নত, আত্মনির্ভর, প্রযুক্তিনির্ভর এবং বিশ্বমঞ্চে প্রভাবশালী ভারত গঠন। এই বারো বছরে অর্থনীতি, পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বহু উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই সাফল্যের বারো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২৬ মে রাজধানী দিল্লি ছিল উৎসবমুখর। রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে দিল্লি যেন এক বিশাল মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল।

গত এক দশকেরও বেশি সময়ে ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অঙ্গনে ভারতের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ব্যবসা সহজীকরণ, ডিজিটাল আর্থিক লেন-দেন এবং উৎপাদনশীল খাতকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে ভারতের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল, সেমিকন্ডাক্টর ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরকে অনেকেই এক নীরব বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রাম থেকে শহর--সর্বত্র ডিজিটাল সেবার বিস্তার

ঘটেছে। সরকারি ভরতুকি, পেনশন, বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা দুর্নীতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার বিস্তারে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম অগ্রগামী দেশ। ছোটো দোকান থেকে বড়ো ব্যবসা— সর্বত্র নগদবিহীন লেন-দেনের প্রসার ঘটেছে। প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন সাধারণ মানুষের সময় ও খরচ কমিয়েছে। দেশব্যাপী মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, সেতু, টানেল, রেলপথ, মেট্রোরেল এবং বিমানবন্দর নির্মাণে অভূতপূর্ব গতি এসেছে সারা ভারতে। যে অঞ্চলগুলি একসময় যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে পিছিয়ে ছিল, সেগুলোও এখন জাতীয় উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সীমান্ত অঞ্চলে সড়ক নির্মাণ, পাহাড়ি এলাকায় টানেল এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিমান পরিষেবা চালু হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

রেলব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, আধুনিক স্টেশন নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন ও দ্রুতগতির ট্রেন পরিষেবার সম্প্রসারণ ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ভারতের অর্থনীতির প্রাণশক্তি কৃষি। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষকের ফসলের বাজার নিয়ন্ত্রণ ছিল একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। সেটিও সুরক্ষিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গ্রামীণ সড়ক, বিদ্যুৎ, আবাসন, পানীয় জল ও ডিজিটাল সংযোগের উন্নয়ন গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বহু গ্রাম আজ উন্নয়নের নতুন ধারায় যুক্ত হয়েছে। দরিদ্র, নারী, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। স্বল্প আয়ের পরিবারের জন্য আবাসন, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, রান্নার গ্যাস সংযোগ, শৌচাগার নির্মাণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি কর্মসূচি কোটি কোটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, আত্মনির্ভর গোষ্ঠী গঠন এবং উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, নতুন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্যবিমা কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মহামারীর সময় ভারতের টিকাকরণ কর্মসূচি আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়। নিজস্ব প্রযুক্তিতে ভ্যাক্সিন উৎপাদন ও বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দ্রুত টিকা প্রদান দেশের সক্ষমতার পরিচয় বহন করে। নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং গবেষণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিকাশে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। হাজার হাজার নতুন উদ্যোক্তা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন।

'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ধারণার মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ জোগানো হয়েছে। প্রতিরক্ষা, ইলেকট্রনিক্স, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, মহাকাশ প্রযুক্তি এবং উৎপাদন শিল্পে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য একটাই— ভারতকে শুধু ভোক্তা নয়, উৎপাদক ও রপ্তানিকারক শক্তিতে পরিণত করা। সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ, সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা এবং দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশীয় যুদ্ধবিমান, ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সীমান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নও এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন গত এক দশকে একাধিক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। চন্দ্র অভিযান, সূর্য পর্যবেক্ষণ মিশন, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ এবং মহাকাশ গবেষণায় ভারতের সাফল্য দেশকে বিশ্বে এক নতুন মর্যাদা এনে দিয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের সক্ষমতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

আজ বিশ্ব রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ভারতের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করেছে। ভারতের ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত পরিচয়কে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ, তীর্থস্থান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক কূটনীতির মাধ্যমে ভারতের সফট পাওয়ার বৃদ্ধি পেয়েছে।

যে কোনো দীর্ঘ শাসনামলের মতো এই সময়কালও বিতর্কমুক্ত নয়। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষক অসন্তোষ, আয় বৈষম্য, সামাজিক মেরুকরণ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশ প্রশ্ন তুললেও সেগুলি অনেকাংশে বিরোধিতার জন্য তর্ক করার মতো।

সমর্থকদের মতে, এত বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় দেশে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনতে আরও সময় লাগবে। তবুও বারো বছরের এই অধ্যায় নিঃসন্দেহে ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমর্থকদের চোখে এটি আত্মবিশ্বাসী, উন্নয়নমুখী ও শক্তিশালী ভারতের উত্থানের যুগ; সমালোচকদের কাছে এটি সম্ভাবনা ও বিতর্কের সমান্তরাল এক অধ্যায়।

তবে একটি বিষয় নিয়ে খুব কমই দ্বিমত রয়েছে, গত ১২ বছরে ভারত দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। সেই পরিবর্তনের অর্জন, প্রত্যাশা এবং আগামীদিনের স্বপ্ন নিয়েই দিল্লিতে বিশাল উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছিল। দেশের কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রম ও অংশগ্রহণে নির্মিত এই যাত্রাপথের বারো বছর পূর্তিতে রাজধানী যেন সত্যিই পরিণত হয়েছিল এক 'চাঁদের হাট'। ◻

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তানপ্রেমী

মণীন্দ্রনাথ সাহা

বাংলাদেশে ভারতের নব নিযুক্ত হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর করা— ‘ভারত-বাংলাদেশ এক হলে বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হবে’ মন্তব্যের ব্যাখ্যা চেয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বাংলাদেশ জামাতে ইসলামির আমির ডাঃ শফিকুর রহমান। তিনি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের পোস্টে লিখেছেন--- ‘১২ জুন পেট্রাপোল-বেনাপোল স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে নবনিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী এবং তাঁর সহধর্মিণী মৃণাল ত্রিবেদী বাংলাদেশে এসেছেন। সেদিন বাংলাদেশে প্রবেশের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন— ভারত ও বাংলাদেশ দুই গণতান্ত্রিক দেশের শক্তি এক হলে বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হবে। এজন্য দুই দেশের সহযোগিতা দরকার। আমাদের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি। তার সঙ্গে ২০ কোটি (বাংলাদেশের) যুক্ত করে ১৬০ কোটি। দুই দেশের জলহাওয়া এক। চ্যালেঞ্জও অনেক ক্ষেত্রে এক। আমরা মিলেমিশে ভিসার সমাধান করব। ভালোবাসা আর পারস্পরিক আন্তরিকতার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। গণতন্ত্রে অনেক ইস্যু থাকে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র শক্তিশালী, আমাদেরও (ভারতে) গণতন্ত্র শক্তিশালী। দুই দেশের মিলেমিশে থাকাটা দরকার। আমার যা দায়িত্ব আছে, তা নিশ্চয়ই পালন করব। কিন্তু আপানাদেরও সহযোগিতা দরকার। ভারত আর বাংলাদেশে যা প্রতিভা আছে, মিলেমিশে থাকলে বিশ্বকে চালানো সম্ভব।’

দীনেশ ত্রিবেদীর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা চেয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন আমির। তাতে তিনি লিখেছেন--- ‘শুক্রবার বাংলাদেশে নতুন ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী পৌঁছানোর পর তাঁর একটি বক্তব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি ভারত-বাংলাদেশের এক হয়ে যাওয়া বলতে কী বুঝিয়েছেন। আমাদের সরকারের উচিত তাঁর কাছ থেকে তা জেনে নেওয়া।’ এ বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে শফিকুর রহমান বলেছেন— ‘তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট না হলে জনমনে অবশ্যই বিভ্রান্তি তৈরি হবে। আমরা আমাদের সরকারের কাছে এই বিষয়টির সুরাহা চাই। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার।’

> **বাংলাদেশকে সোজা করতে তাদের দিকে কোনো সমরাস্ত্র নিক্ষেপের প্রয়োজন নেই। শুধু সীমান্তমুখী ট্রাকগুলির মুখ একটু ঘুরিয়ে দিলেই হবে। তাতেই কতধানে কত চাল বাংলাদেশ বুঝতে পারবে। তাদের ভারত বিরোধিতাও নিমেষে উবে যাবে।**

এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর অনেকেই বলছেন— সত্যি, ভাবতে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে দেশভাগের ৭৯ বছর পরেও ভারতের রাজনীতিকদের বোধোদয় হলো না। অখণ্ড ভারতে যাদের মূল বক্তব্য ছিল— মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করতে পারে না। তার জন্য মুসলমানদের আলাদা দেশ পাকিস্তান চাই। এবং ঠিক তারা তাদের প্রাপ্য অংশের চেয়েও বেশি পরিমাণ সম্পত্তি নিয়ে ভারত থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। পরে সেই পূর্ব পাকিস্তানিরাই পুনরায় ভারতের অস্ত্র, অর্থ, খাদ্য, সামরিক সাহায্য নিয়ে সেই সাধের পাকিস্তানের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশি হওয়ার পরই ভারতের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেছে। সেই বাংলাদেশিদের নিয়ে ভারতীয় নেতাদের

বিশ্বশক্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

বাংলাদেশের যখন জন্ম হলো, তখন অনেক বাংলাদেশিই বলেছিল, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ, বাংলাদেশের একদিকে সাগর ও তিনদিকে ভারতদেশ দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে। তাদের থেকে আক্রমণের আশঙ্কা নেই! কিন্তু তিন বছর না যেতেই পরিস্থিতি পালটে গেল। বাংলাদেশের খোলনলচে পালটে গেল। এখন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী তৈরি হয়েছে। তারা সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত। দেশের বেশিরভাগ লোকের খাওয়া-পরা না জুটলেও, সামরিক সাজ সরঞ্জাম পাওয়ার পক্ষে অসুবিধা নেই। যেসব দেশ তাদের অন্ন জোগাচ্ছে, তারা অস্ত্রও জোগাচ্ছে। পূর্বাঞ্চলে ভারতকে সামরিক চাপ থেকে মুক্ত রাখতে ভারত বাংলাদেশের জন্মদানে মদত জুগিয়েছিল। কিন্তু বিশ-ত্রিশ বছর যেতে না যেতেই সেই বাংলাদেশই ভারতকে পূর্ব প্রান্তে ব্যতিব্যস্ত রেখে পশ্চিমপ্রান্তে পাকিস্তানের পরম সুবিধা করে দিচ্ছে।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ ২০০১ সালে, অর্থাৎ ৩০ বছরের মধ্যে তার পাকিস্তানি চরিত্র ফিরে পেয়েছিল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমানদের হীন চরিত্রের পরিচয় হিন্দুরা পেয়েছিল। ২০০১ সালে নতুন করে তারা তাদের পূর্বতন চরিত্রের পরিচয় দান করেছে নতুন প্রজন্মের হিন্দুদের কাছে। তাদের এই নৃশংস ও অমানবিক চরিত্রের লক্ষণের সঙ্গে চোদ্দশো বছর আগের প্রচলিত ও প্রচারিত ইসলামের কোনো ফারাক নেই। খালেদা জিয়ার পর শেখ হাসিনা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসলে হিন্দুরা মনে করেছিল তারা এবার গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা পাবেন এবং বাংলাদেশের ভূমিপুত্র হিসেবে তারা নির্ভয়ে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল পুনরায় বাংলাদেশি মুসলমানদের মনে খাঁটি ইসলামি ভাবধারা চাগাড় দিয়ে উঠেছে। শুরু হলো হিন্দুদের সম্পত্তি দখল, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ধর্মান্তরণ এবং হিন্দু হত্যা ও বিতাড়ন প্রক্রিয়া। সেই সময় হিন্দুদের ওপর চরম অত্যাচার শুরু হওয়ার পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (প্রথমবারের প্রেসিডেন্ট থাকার সময়) সামনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়া সাহা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থার বর্ণনা করে বলেছিলেন--- 'মহাশয়, বাংলাদেশ থেকে এসেছি... ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ- খ্রিস্টান বাংলাদেশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। দয়া করে আমাদেরকে সাহায্য করুন... আমরা আমাদের দেশে বসবাস করতে চাই।... আমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করতে চাই না। আমি আমার বাড়ি হারিয়েছি, তারা আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, সম্পত্তি দখল করেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সুবিচার পাইনি। দয়া করে সাহায্য করুন...।' কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার আজও বন্ধ হয়নি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে শেখ হাসিনাকে গদিচ্যুত করে দেশ থেকে বিতাড়নের পরের ঘটনাগুলো এখনও সকলেই মনে রেখেছেন সেজন্য এখানে তা আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

অখণ্ড ভারতের মুসলমানরা যে হিন্দু বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে ভারত ভেঙে তাদের জন্য আলাদা দেশ আদায় করেছিল সেই হিন্দু বিরোধিতা বর্তমান পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মুসলমানরা এখনও বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকার যতই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুক না কেন বাংলাদেশ কোনোদিনই ভারতকে যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি ভারত বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের কোনো দেশের হিন্দুদেরও বিশ্বাস করে না। তাই ভারতের নব নিযুক্ত হাইকমিশনের বক্তব্যে ডাঃ শফিকুর রহমান আঁতকে উঠেছেন এই ভেবে যে, এবার হয়তো ভারত বাংলাদেশ দখল করে নেবে। কিন্তু তারা জানে না যে আবর্জনা ভেবে বিশ্বের বহু দেশ এখন বাংলাদেশি মুসলমানদের বিতাড়ন শুরু করেছে। এইরকম পরিস্থিতিতে ভারত ২০ কোটি বাংলাদেশি মুসলমানকে আবর্জনা নিজের ঘরে তুলবে সে চিন্তা কোনো ভারতবাসী যেমন করে না তেমনি ভারতের মুসলমানরাও করে না।

ভারতের প্রতি বাংলাদেশের শত্রুতামূলক আচরণের জন্য পূর্ববর্তী ভারত সরকার যেমন দায়ী ছিল তেমনি বর্তমান ভারত সরকারও কম দায়ী নয়। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশপ্রেমী ৩৪ বছরের সিপিএম সরকার এবং পরের ১৫ বছরের তৃণমূল সরকার সাড়ে পনেরো আনা দায়ী। বাংলাদেশের সমস্ত আবদার ও চাহিদা বিনা বিচারে মেনে নিয়ে এবং ভারতের সঙ্গে বৈরীসুলভ আচরণে এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনে মূক বধির সেজে ভারত সরকারই বাংলাদেশে মুসলমানদের সাহস জোগাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন--- ভারত সরকারের উচিত পাকিস্তানের সঙ্গে 'টিট ফর ট্যাট' নীতির মতোই বাংলাদেশের সঙ্গে 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর' নীতি গ্রহণই সঠিক কাজ হবে। 'মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না'— এই নীতি এখন ত্যাগ করা উচিত। বেয়াদপের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রাখা মানায় না। বাঁকা বাংলাদেশকে সোজা করতে হলে বাংলাদেশের দিকে কোনো সমরাস্ত্র নিক্ষেপের প্রয়োজন নেই। শুধু সীমান্তমুখী ট্রাকগুলির মুখ একটু ঘুরিয়ে দিলেই হবে। তাতেই কতধানে কত চাল বাংলাদেশ বুঝতে পারবে। তাদের ভারত বিরোধিতাও বন্ধ হয়ে যাবে। □

অসংখ্য প্রশ্নের মীমাংসা খোঁজা এক অভিজ্ঞতা

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

ভোট প্রচার তখন তুঙ্গে। বিধানসভার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দৌড়। জনসংযোগ, পথসভা। সবশেষে পরিকল্পনা রূপায়ণের খুঁটিনাটি আলোচনা। সকাল সাতটা থেকে রাত্রি দু'টো অন্তহীন কর্মব্যস্ততার রোজনামচা। সেদিন আমার নিজের গাড়িতে দু-তিনজন, গাড়ির সামনে-পেছনে কিছু কার্যকর্তা। বাজার পেরিয়ে গাড়িটা সবেমাত্র গতি তুলেছে। পথবাতির অল্প আলো। হঠাৎ ব্রেকে পা পড়লো ড্রাইভারের। গাড়ির প্রায় সামনে এসে পড়েছেন এক প্রৌঢ়। দু'হাত তুলে গাড়ি থামানোর আপ্রাণ চেষ্টা। পরনে লুঙ্গি, সঙ্গে ফতুয়া। মাথায় ফেজ টুপি ও দাড়ি।

থতমত খেয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। ড্রাইভারের গাড়ি থামানোর ইচ্ছে নেই। গাড়ির মধ্যে যারা ছিল তারাও না থামানোর পক্ষে। পরের কার্যক্রম তাদের বাহানা। বরং দ্রুতগতিতে গাড়িটা বের করে নিয়ে যাওয়াই তাদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত। ধমক দিয়েই বললাম— গাড়ি থামাও।

গাড়ি থেকে নামলাম। সঙ্গে থাকা জনা কুড়ি মানুষ তখন ঘিরে ধরেছেন। এক বৃদ্ধ শীর্ণ হাতটা আমার মাথায় রেখে বললেন— 'আল্লার দোয়া, তুমিই এই ভোটে জিতবে।' বিশ্বাস করার মতো একটা দৃঢ়তা তাঁর বলার মধ্যে ছিল। এতক্ষণে চারদিকের অসহিষ্ণুতা পরিবর্তিত হয়েছে বিস্ফারিত আগ্রহে। পরের প্রোগ্রামের বাহানা আর দেখাচ্ছেন না কেউ। অনর্গল তিনি বলে চলেছেন। সব কথাগুলো কেবল আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। আমি অস্থির হচ্ছি, পরবর্তী কার্যক্রমের তাড়ায় আর প্রয়োজনহীন কথার ভারে। তোষামোদকারীকে গুরুত্ব দেওয়া আমার ধাতে নেই।

কথা বলার ধরনটা ভালো। বেশ একটা চটক আছে। বেশ কিছুদিন বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা লোকেদের মতো। দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে শুরু করলেন— তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করেছে। সংখ্যালঘুদের ভোট পাওয়ার কোনো অধিকার নেই তৃণমূলের। অত্যন্ত আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বলে চললেন— ওয়াকফ বিল কিংবা সিএএ নিয়ে সংখ্যালঘুদের খেপিয়ে তুলেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। তাদের দিয়ে কোটি কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করিয়েছেন। সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে কেবল হিন্দু হওয়ার অপরাধে কুপিয়ে হত্যা করিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। অথচ ভোটের ঠিক আগে চুপচাপ কেন্দ্র সরকারের ওয়াকফ বিলের সব শর্ত মেনে নিয়ে সই করে দিয়েছেন। এসআইআর নিয়ে মুসলমানদের ভুল বুঝিয়ে চলেছেন। তৃণমূল দেশবিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে। সরকারি চাকরি কিংবা আধুনিক শিক্ষায় উৎসাহিত না করে মুসলমানদের মজহবি আবেগকে সামনে রেখে কেবল একটা ভোটারে রূপান্তরিত করেছে তৃণমূল। প্রতিটি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যত মানুষ মারা যায় এবং যাঁরা তাদের হত্যা করে তাদের দু'দলের বেশিরভাগই মুসলমান।

আরও অনেক কিছু বলতে চাইছিলেন। থামাতে হলো ভদ্রলোককে। যাওয়ার আগে আর একবার মাথায় হাতে রেখে বললেন— 'জয় তোমার নিশ্চিত'। অন্যরকম একটি শিহরণ খেলে গেল গোটা শরীরে। আমার সঙ্গে যারা ছিলেন তারা তো আপ্লুত। রামনগর বিধানসভার ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ভোটারের ২৯ হাজার হলো এই তথাকথিত সংখ্যালঘু; ১০ শতাংশ আমরা পেয়ে গেলে জয়ের ব্যবধানটা আরও চমকপ্রদ হবে নিশ্চিত। এই ঘটনাটা গোটা ভোট প্রচারে আমাকে অন্যরকম শক্তি জুগিয়েছে। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আগে যে ভয় ছিল, তা প্রায় উধাও। মুসলমানদের দেখলেই মনে হতো বিজেপিকে ভোট দেওয়ার তারা জন্য প্রচণ্ড অস্থির। আমার বিধানসভার ১২টি এমন বুথ আছে যেখানে প্রায় ১০০ শতাংশ মুসমান। ভদ্রলোক তেমনি একটি বুথের ভোটার।

নির্বিঘ্নে ভোট হলো। অপ্রয়োজনীয় ভাবে মুসলমান বুথগুলোতে গেলামও। ৪ মে ভোট গণনা। গণনাকেন্দ্রের ভেতরে সেই নির্দিষ্ট বুথগুলির প্রতি আমার বাড়তি আগ্রহ ছিল। ফলাফল হাতে এলে খাতা-কলম নিয়ে বসলাম হিসেব মেলাতে।

বুথ নম্বর ৪৭-তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ৪৭৯, বিজেপি-৪; বুথ নম্বর ৪৮ তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ৪৮৫, বিজেপি ৩; বুথ নম্বর ৫৩-তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ৮৫৪, বিজেপি ১৫; বুথ নম্বর ৫৫-তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ৭৭১ বিজেপি ২২; বুথ নম্বর ৭১-তৃণমূল ৫৮৮, বিজেপি ০৫; বুথ নম্বর ২৬৭-তৃণমূল ১০৫২, বিজেপি ৬৮। পরিসংখ্যানটা আরও লম্বা হতে পারত। পরিস্থিতি বোঝার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট।

মনে করতে লাগলাম আলো আঁধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোক। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ। আমরা ব্যক্তিগত তুমুল প্রশংসা। তৃণমূল দল এবং সরকারের ভয়ংকর বিরুদ্ধাচারণ। হাতে পাওয়া ফলাফল নাকি মানুষটা, কোনটা ঠিক? আলো আঁধারে দেখা সেই লোকটিকে আমি আর কখনো খুঁজে পেতে চাই না। গোটা সম্প্রদায়টি যে চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক— এই নির্মম সত্যটি এই নির্বাচন আমাকে শিখিয়েছে। ব্যতিক্রম হবার কোনো সম্ভাবনাকে বিন্দুমাত্র বাঁচিয়ে রাখেনি ওরা। মনে হয়েছে এখানে শিক্ষা নেই, শিক্ষিত মানুষের বিচরণ নেই, ব্যতিক্রমী ভাবনার অবকাশ নেই, ব্যক্তির নিজস্ব কোনো চিন্তন নেই। কিছু নেই মুসলমানদের সেই দুনিয়ায় মৌলবিদের জানাজায় মাটি না দেওয়া ফতোয়ার ভয় আছে। এই ভয়ের ভেতরেই বোধহয় লুকিয়ে সুতীব্র এক হিংস্রতা। মজহব ও রাজনীতিকে আলাদা না করতে পারার অশালীন এক গোঁয়ার্তুমি। এই মানসিকতা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে।

ভক্তি বনাম অবমাননা : বিসর্জনের পর দায়িত্ব কোথায় ?

শ্রীভৈরব

মূর্তির বিসর্জন নাকি অবহেলার সূচনা ?

সনাতন ধর্মে বিসর্জনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য গভীর। এটি কোনো সমাপ্তি নয়; বরং দেবত্বের মহাপ্রকৃতির সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রতীক। কিন্তু বাস্তব চিত্র অনেক সময় এই ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পূজা শেষ হওয়ার কয়েকদিন পরই গাছের নীচে, নদীর পাড়ে, খালের ধারে, রাস্তার পাশে কিংবা বিভিন্ন ফাঁকা জায়গায় ভাঙা প্রতিমা, খড়-বাঁশের কাঠামো এবং রঙের অবশিষ্টাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। যে দেবীকে আমরা মাতৃরূপে আরাধনা করেছি, যাঁর সামনে মাথা নত করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি, বিসর্জনের পর তাঁর প্রতীককে এভাবে অবহেলায় ফেলে রাখা কি সত্যিই ভক্তির পরিচয় বহন করে ?

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, বহু প্রতিমায় প্লাস্টার অব প্যারিস, রাসায়নিক রং, প্লাস্টিক ও থার্মোকল পরিবেশের ওপর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এগুলো নদী ও জলাশয়ের জলদূষণ বাড়ায়, জলজ প্রাণীর ক্ষতি করে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে।

পরিবেশ রক্ষা তো ধর্মেরই অংশ।

ভারতীয় দর্শন প্রকৃতিকে দেবত্বেরই প্রকাশ হিসেবে দেখে। হিন্দু শাস্ত্রে নদীকে মাতা, বৃক্ষ ও ভূমিকে দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা কিংবা অন্যান্য নদী শুধু জলধারা নয়; এগুলি আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার অংশ।

সেই কারণেই পরিবেশ রক্ষা কোনো আধুনিক ধারণা নয়; এটি সাংস্কৃতিক দায়িত্বেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদি আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফলে প্রকৃতির ক্ষতি হয়, তাহলে সেই আচারের পদ্ধতি নিয়ে আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন।

ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ : ভারতের বাস্তব উদ্যোগ

অনেকের ধারণা, পরিবেশবান্ধব বিসর্জন ব্যবস্থা এখনও কেবল কল্পনা। বাস্তবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রকল্প চালু হয়েছে।

- CPCB Idol Immersion Guidlines— পরিবেশবান্ধব প্রতিমা ও বিসর্জন সংক্রান্ত জাতীয় নির্দেশিকা।
- Delhi Artificial Immersion Pond Initiative— যমুনা নদীর দূষণ কমাতে কৃত্রিম বিসর্জন জলাধার।
- Mumbai BMC Artificial Pond Programme— কৃত্রিম ট্যাঙ্ক ও বিসর্জন ব্যবস্থাপনা।
- Nashik Municipal Corporation Eco-Visarjan Programme— কৃত্রিম পুকুর ও নির্মাল্য কম্পোস্টিং।
- Ahmedabad Pavitra Genesh Visarjan Kund Project— বিসর্জনের জন্য বিশেষ কৃত্রিম কুণ্ড।
- Vadodara Idol Water Rrcycling Intiative— বিসর্জনের জল পরিশোধন ও মাটি পুনর্ব্যবহারের উদ্যোগ।

এই উদ্যোগগুলি প্রমাণ করে যে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেও পরিবেশ রক্ষা সম্ভব।

ভবিষ্যতের ভাবনা

যদি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাটির প্রতিমার বিসর্জন-পরবর্তী পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তাহলে একদিকে যেমন নদী ও জলাশয় রক্ষা পাবে, তেমনি অন্যদিকে দেব-দেবীর প্রতীকও অবহেলার শিকার হবে না।

প্রতিমার বাঁশ ও কাঠামো পুনর্ব্যবহার, বিসর্জনের জল পরিশোধন, অবশিষ্ট মাটি কৃষি বা উদ্যানচর্চায় ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণে উৎসাহ দেওয়া— এসব পদক্ষেপ ভবিষ্যতের জন্য একটি সুষম ও দায়িত্বশীল পথ দেখাতে পারে।

ধর্ম আমাদের কেবল আচার শেখায় না; শেখায় দায়িত্ববোধ, সংযম ও সচেতনতা। ভক্তির প্রকৃত মূল্য তখনই প্রকাশ পায়, যখন তা আচরণের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়।

আসুন, আমরা এমন এক সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাই, যেখানে বিসর্জন মানে অবহেলা নয়, বরং তা হোক দায়িত্বশীল বিদায়। যেখানে দেবীকে আরাধনা করার পাশাপাশি তাঁরই রূপ প্রকৃতিকেও সমান শ্রদ্ধা জানানো হবে।

ভক্তির সঙ্গে যুক্ত হোক পরিবেশ-সচেতনতা, উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হোক দায়িত্ববোধ, আর আচরণের সঙ্গে যুক্ত হোক প্রকৃতির প্রতি গভীর সম্মান।

তবেই আমাদের ভক্তি হবে আরও অর্থবহ, আরও মানবিক এবং আরও সত্য। ◻

হিন্দুদের ক্ষাত্রবলে বলীয়ান হতে হবে

অনেককাল ধরেই একটা কথা ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে লোকমুখে প্রচারিত হচ্ছে যে হিন্দুদের ভেদাভেদ ভুলে এক হতে হবে। ভেদাভেদের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এককালের মহাশক্তিশালী হিন্দু সমাজ জড়, পরস্পরবিচ্ছিন্ন, দুর্বল ও আত্মঘাতী হয়ে বিদেশি শক্তির কাছে মাথা নুইয়ে পরাভব ও গ্লানি ভোগ করেছিল। হিন্দু সমাজ অনৈক্যজর্জর, সুতরাং সবার আগে হিন্দুর ঐক্য চাই। 'হিন্দু এক হও'— এই উদ্‌ঘোষ কয়েক শতাব্দী ধরেই এদেশের জনমানসে গুঞ্জরিত হচ্ছে। হিন্দুর যে অনৈক্য আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যাটা শুধু ঐক্যহীনতার নয়, সমস্যাটা অন্য জায়গায়।

হিন্দুদের সমস্যা হচ্ছে, হিন্দুরা যে মার খাচ্ছে, হিন্দুরা যে পরাজিত হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে এর কারণ শুধু এই নয় যে হিন্দুদের একতা নেই, বরং এর কারণ এই যে হিন্দুদের ক্ষাত্রস্বভাব নেই, তেজ নেই, প্রতিশোধস্পৃহা নেই; কালের প্রবাহে হিন্দুদের বীরভাব ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। হিন্দুরা নরম হতে হতে ছাগলের মতো হয়ে গেছে। কিছু হলেই পুলিশ চাই, প্রশাসন চাই, সরকার চাই, নতুন কোনো অবতার চাই তাদের বাঁচাতে। কেন তাদের ঘরের মেয়ের গায়ে হাত লাগলে তারা বীরভাব প্রকাশ করতে পারে না? তাদের ধর্মে আঘাত লাগলে কেন তারা কে সংখ্যায় কম কে সংখ্যায় বেশি এসব ভাবনা ছেড়ে ক্ষত্রিয়সুলভ আচরণ করতে পারে না? কীসের এত ভয়? কীসের এত হীনম্মন্যতা? কীসের এত কাপুরুষতা? সমস্যাটা শুধু ঐক্যের নয়, সমস্যাটা শক্তির। প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যে ক্ষাত্রভাব ছিল, যুদ্ধশাস্ত্র ছিল, মন্দিরে মন্দিরে শস্ত্রদেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল, জীবনে অহিংসা ও হিংসার সুষ্ঠু সমন্বয় ছিল, সংকটকালে সুপুষ্ট বাহু অস্ত্রধারণে সংকোচ করত না। অথচ বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে কোনো ক্ষাত্রভাব নেই, বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র নেই, নিদেন পক্ষে একটি লাঠিও নেই। সমাজে শস্ত্রদেবতার পূজা নেই শুধু অহিংসার মদিরাপানে মত্ত।

বেদকাল থেকে থেকে মহাভারত, গুপ্ত যুগ অবধি হিন্দুদের ইতিহাস ও চরিত্র এক, আর আজকের হিন্দুদের ইতিহাস ও চরিত্র আর এক। কোনো মিল নেই, কোনো চারিত্রিক সামঞ্জস্য নেই। 'তৃণাদপি সুনিচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা'র মন্ত্র জপা ভাবপ্রবণ অহিংসক হিন্দু কোন শক্তিতে জেহাদি শক্তির প্রবল আক্রমণের মোকাবিলা করবে? ঠাকুর-গুজ্জর-জাঠ-রাজপুত ইত্যাদি কয়েকটা সম্প্রদায় বাদে হিন্দুদের মধ্যে যোদ্ধাভাব নেই। আর নিষ্ঠুর শোনালেও বলতে হয় যে কালের বুকে দুর্বল ব্যক্তি বা জাতির কোনো স্থান নেই, প্রকৃতির করাল গ্রাসে কালক্রমে তারা লুপ্ত হয়।

তাই হিন্দুদের শক্তিপূজা করতে হবে, শস্ত্রপূজা করতে হবে, পশুরাজ সিংহের মতো যোদ্ধাভাব সম্পন্ন হতে হবে, নতুবা গোরুর মতো মোল্লার হাতে জবাই হওয়ার জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করতে হবে।

—**সঞ্জীব মণ্ডল,**
দত্তপুকুর, উ: ২৪ পরগনা।

বন্দে মাতরম্ : ভারতবর্ষকে বাঙ্গালির এক অনন্য দান

ভারতে জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলি কেবল উচ্চারণমাত্র নয়— একটি যুগের চেতনা, আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। 'বন্দে মাতরম্' তেমনই এক মহামন্ত্র। এটি শুধু একটি গান নয়, এটি ভারতীয় জাতীয়তার এক সাংস্কৃতিক ঘোষণাপত্র যা ভারতবর্ষকে বাঙ্গালির প্রদত্ত এক অনন্য ও অমূল্য উপহার।

পরাধীনতার কালে ভারতবাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন হারিয়েছিল, তেমনি বহু মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক গৌরবও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। সেই সময় বঙ্গের নবজাগরণের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক, চিন্তক ও মনীষীরা ভারতীয় আত্মপরিচয়ের পুনর্জাগরণে উদ্যোগী হন। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন 'বন্দে মাতরম্'।

'বন্দে মাতরম্' শব্দের আক্ষরিক অর্থ— 'মা-কে বন্দনা করি' বা 'মাতৃভূমিকে প্রণাম' অথবা 'জন্মভূমির বন্দনা'। বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমিকে কেবল ভৌগোলিক ভূখণ্ড হিসেবে দেখেননি; তিনি তাকে দেবীরূপে, মাতৃরূপে, শক্তিরূপে এবং সভ্যতার ধারক হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠে অন্তর্ভুক্ত এই গান ভারতীয় সাহিত্যকে এক নতুন দিক দর্শন করে— যেখানে দেশপ্রেম গভীর ও পবিত্র হয়ে ওঠে।

গানের প্রথম অংশে মাতৃভূমির সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে— 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।' এই ক'টি শব্দেই ফুটে উঠেছে ভারতের প্রকৃতি, কৃষিভিত্তিক জীবন, ঐশ্বর্য এবং জন্মভূমির প্রতি গভীর ভক্তি। ভাষার অলংকার, সংস্কৃতঘন শব্দচয়ন এবং কাব্যিক মহিমা গানটিকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

'বন্দে মাতরম্'-এর প্রকৃত শক্তি প্রকাশ পায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে পথে পথে, সভায়, মিছিলে, ছাত্রসমাজের কণ্ঠে এই গান ধ্বনিত হতে থাকে। সাধারণ মানুষ থেকে বিপ্লবী যুবক— সকলের কাছে এটি হয়ে ওঠে সংগ্রামের আহ্বান। ব্রিটিশ সরকার বহু স্থানে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও গানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল— এটি কেবল গান নয়, এটি এক জাতির উত্থানের ভাষা, জাগরণের ভাষা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অসংখ্য মানুষ ফাঁসির মঞ্চে, কারাগারে এবং আন্দোলনের মুহূর্তে এই ধ্বনি উচ্চারণ করেছে। তবে 'বন্দে মাতরম্'-এর গুরুত্ব শুধু রাজনৈতিক নয়; সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও গভীর। বাংলাভাষায় রচিত একটি

সাহিত্যকর্ম কীভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় আবেগের ভাষা হয়ে উঠতে পারে— তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এই গান। বাংলাভাষা এখানে আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় পরিচয় নির্মাণ করেছে।

স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক পরিসরে 'বন্দে মাতরম্'-কে জাতীয় গানের মর্যাদা প্রদান করা হয়। যদিও জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে অন্য গান গৃহীত হয়েছে, তথাপি 'বন্দে মাতরম্' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের অন্যতম প্রতীক হিসেবে আজও সমানভাবে সম্মানিত। আনন্দের বিষয় হলো, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গানটি বাধ্যতামূলক করেছে।

আজ যখন 'বন্দে মাতরম্'-এর দীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রাপথের দিকে ফিরে তাকাই, তখন উপলব্ধি করি— এটি কেবল একটি গান নয়; এটি বাঙ্গালির সাহিত্যসাধনা, সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস এবং ভারতের জাতীয় চেতনাকে প্রদত্ত এক অনন্য দান। যে দান ভাষার সীমা ছাড়িয়ে একটি জাতির আত্মাকে স্পর্শ করেছে।

—সুভাশিস পাইন,
কদমা, তালডাংড়া, বাঁকুড়া।

মগরাহাটে ফ্লাইওভার চাই

লেভেল ক্রসিঙের অসহ্য যানজটে হাঁটার উপায় নেই, দাঁড়ানোর জায়গা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেলগেট বন্ধ থাকে। স্কুলের বাচ্চা, অফিসযাত্রী, রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স— সবাই আটকে থাকে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে। ট্রেন মিস হয়, চাকরির ইন্টারভিউ মিস হয়, পরীক্ষার হল মিস হয়। এত ভিড়! সংকীর্ণ রাস্তার দুপাশে দোকানপাট, ফুটপাত দখল, তার ওপর অটো, লরি, বাস, সাইকেল, রিকশার জট। পথচারী থেকে ট্রেনের নিত্যযাত্রী--- সবাই নাজেহাল, ক্লান্ত, অসহায়।

এটা একদিনের চিত্র নয়। এটাই মগরাহাটের নিত্যদিনের যন্ত্রণা। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা— কোনো ঋতুতেই রাস্তায় চলাচলের ভরসা নেই। গ্রীষ্মে পিচ গলে পা আটকে যায়। বর্ষায় জল নিকাশের জায়গা নেই, রাস্তায় জল জমে থাকে। গাড়ি চললে ছিটকে ওঠে সেই পচা জল, সারা শরীর ভিজে যায়। আর কাদা। শীতে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় সামনের পথ। রেলগেট পড়লেই দুদিকে দু-তিন কিলোমিটার লম্বা গাড়ির লাইন। হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা, ধুলোয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

কত দুর্ঘটনা ঘটে এই অভিশপ্ত ক্রসিঙে। তাড়াহুড়ো করে লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে কত তাজা প্রাণ। আমার নিজের দাদা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান র‍্যাশ ড্রাইভিঙের জন্য। উলটোদিক থেকে আসা ট্রাকের ধাক্কায় চোখের সামনে সব শেষ। সেই মর্মান্তিক ঘটনা আজও দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে। প্রতিদিন কেউ-না-কেউ আহত হয়, পঙ্গু হয়। শিশু কোলে মা, হাত ধরে বৃদ্ধ বাবা— কারও জীবনের গ্যারান্টি নেই এখানে।

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মগরাহাটে একটি ফ্লাইওভার এখন সময়ের দাবি, প্রাণের দাবি। এই দাবি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমি চিঠি লিখেছি। রেল কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি— সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। একটা ফ্লাইওভার মানে শুধু কংক্রিটের কাঠামো নয়, একটা ফ্লাইওভার মানে হাজার হাজার মানুষের কর্মঘণ্টা বাঁচা, মুমূর্ষু রোগীর দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানো, শত শত পরিবারের প্রাণ বাঁচা। উন্নয়ন মানে শুধু আলোর মালা নয়, উন্নয়ন মানে আগে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা। মগরাহাট আবার সুন্দর হয়ে উঠুক। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই কলম থামবে না, এই লড়াই থামবে না।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকার সম্ভব নয়

আজ তৃণমূলের দোষ ধরা পড়েছে। পচা ডিম ও গোবরের সদ্ব্যবহার হচ্ছে। এতো ভুরি ভুরি অভিযোগ আজ কেন? আগে কেন হয়নি? এই কথার গভীরে গেলে উত্তর আসবে 'ভয়'। উত্তর আসবে 'নিরাপত্তাহীনতা'। কী কী অভিযোগ আজ আসছে। চুরি, কাটমানি, তোলাবাজি ইত্যাদি। নিরাপত্তার কথা বললে বলতে হয় নিরাপত্তা দেয় প্রশাসন। নিরাপত্তা পাওয়া অবশ্যই মানুষের অধিকার। নিরাপত্তা না পেলে মানুষের কর্তব্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করা। কখনো আমরা তা দেখতে পাইনি। অবশ্যই অভয়া কাণ্ডের পর মানুষ পথে নেমেছিল। ওই আন্দোলনকে বামপন্থীরা কুক্ষিগত করতে গিয়ে বিজেপির নেতা-কর্মীদের পথ আটকেছে। এরা এতটাই অপদার্থ যে অভয়ার মা নিরুপায় হয়ে বিজেপির টিকিটে ভোটে দাঁড়ালে তাকেও নোংরা ভাষায় আক্রমণ করতে ছাড়েনি। বিজেপির কাছে অভয়ার মৃত্যু যতটা কষ্টদায়ক ঠিক তামান্নার মৃত্যুও সমান বেদনাদায়ক। কারও মৃত্যুতে সিপিআইএম রাজনীতি অবশ্যই করে। ওদের উলুবেড়িয়ার মুসলমান সদস্য খুন হলে ওরা 'ইনসাফ' যাত্রা করে। কিন্তু হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস পিতা পুত্র নিজের বাড়িতে জঙ্গিদের হাতে নিহত হলেও তার জন্য কোনো আন্দোলন করেনি। এই ভাবেই ওরা তৃণমূল সরকারকে বকলমে সাহায্য করেছে! বিজেপি বার বার এই কথা বলেছে, কোনো বুদ্ধিজীবী কোনো সাধারণ মানুষ এবং কোনো তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ বিজেপিকে সাহায্য করতে আসেনি। কীসের ভয় ছিল? কীসের নিরাপত্তাহীনতা ছিল সেক্ষেত্রে? নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দায় কেন কেউ অনুভব করেননি? আর আজ সবাই ডিম-গোবর নিয়ে বীরত্ব দেখাচ্ছেন কেন? বছরের পর বছর ধরে বিজেপি যখন অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, বুকে হাত দিয়ে বলুন কত জন তখন বিজেপির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

একজন নারীর সবচেয়ে বড়ো শক্তি—শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাকি আত্মসম্মান ?

অরুণা রায় চৌধুরী

একসময় নারীর ভূমিকা শুধুমাত্র পরিবার ও গৃহস্থালির কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করা হতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যবসা, শিল্প-সংস্কৃতি এবং সমাজসেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

একটি প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্তু একজন নারীর প্রকৃত শক্তির উৎস কোথায়? শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাকি আত্মসম্মান? এই তিনটি বিষয়ই নারীর উত্তরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি বিষয়ের ভূমিকা আলাদা এবং একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষা হলো মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রধান হাতিয়ার। একজন নারী যখন শিক্ষিত হন, তখন তিনি শুধু পড়তে বা লিখতে শেখেন না; তিনি নিজের অধিকার, দায়িত্ব এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। শিক্ষা তাকে যুক্তিবাদী চিন্তা করতে শেখায়, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে এবং সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়। একজন শিক্ষিত নারী সাধারণত পরিবারে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সন্তানের শিক্ষা এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়ে বেশি সচেতন হন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই বলা হয়, একজন নারীকে শিক্ষিত করা মানে একটি জাতিকে শিক্ষিত করা।

শিক্ষা আত্মবিশ্বাসও বাড়ায়। একজন শিক্ষিত নারী অন্যায়, বৈষম্য বা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পান। তিনি আইন ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে জানেন এবং প্রয়োজনে নিজের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন। তাই নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শিক্ষা।

শিক্ষার পর যে বিষয়টি একজন নারীর জীবনে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আনে, তা হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারী নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারেন। তিনি নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকেন না এবং পরিবার ও সমাজে তার মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ নারী চাকরি, ব্যবসা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং পেশাগত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা শুধু নিজেদের জীবন পরিবর্তন করেননি, বরং পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

তবে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করলেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেও অনেক নারী সামাজিক চাপ, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ বা আত্মবিশ্বাসের অভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পারেন না। এখানেই আত্মসম্মানের গুরুত্ব সামনে আসে।

আত্মসম্মান এমন একটি মানসিক শক্তি, যা নিজের মূল্য উপলব্ধি করতে শেখায়। এটি কোনো ডিগ্রি, চাকরি বা সম্পদের উপর নির্ভর করে না। আত্মসম্মান হলো নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার মানসিক দৃঢ়তা। একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নারী জানেন যে তিনি সম্মান পাওয়ার যোগ্য। তিনি নিজের স্বপ্ন, মতামত এবং অনুভূতির মূল্য বোঝেন। তাই তিনি অন্যের খুশির জন্য নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দেন না।

শিক্ষা একজন নারীকে সচেতন করে। সেই সচেতনতা তাকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। আর আত্মসম্মান তাকে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর শক্তি দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা হলো ভিত্তি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হলো সক্ষমতা এবং আত্মসম্মান হলো সেই শক্তি যা এই দুটিকে অর্থবহ করে তোলে।

একজন নারীর সবচেয়ে বড়ো শক্তি কী, এই নির্দিষ্ট কোনো উত্তর নেই। শিক্ষা তাকে জ্ঞান দেয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাকে ক্ষমতা দেয় এবং আত্মসম্মান তাকে মর্যাদা দেয়। তবে এই তিনটির মধ্যে আত্মসম্মানকে সবচেয়ে গভীর শক্তি বলা যায়, কারণ এটি একজন নারীকে নিজের মূল্য বুঝতে শেখার এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেয়।

প্রকৃত অর্থে একজন শক্তিশালী নারী তিনিই, যিনি শিক্ষিত, স্বাবলম্বী ও আত্মমর্যাদাবোধে দৃঢ়। কারণ জ্ঞান, সক্ষমতা এবং আত্মসম্মানের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে এমন একজন নারী, যিনি শুধু নিজের জীবন নয়, পরিবার, সমাজ এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকেও আলোকিত করতে পারেন।

সারকোপেনিয়া ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সারকোপেনিয়া বা মাংসপেশির ক্ষয়রোধ হলো বয়সজনিত এমন এক অবস্থা, যেখানে ধীরে ধীরে পেশির ভর, শক্তি ও কার্যক্ষমতা কমে যায়। সাধারণত ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সের পর থেকে

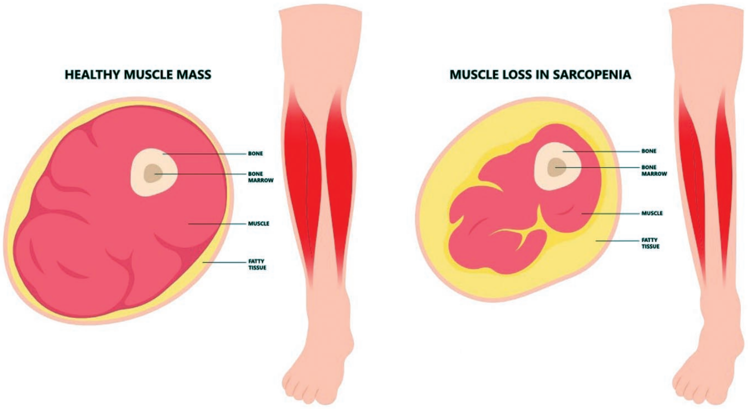

এই ক্ষয় শুরু হয় এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতাও বাড়তে থাকে।

সারকোপেনিয়ার প্রধান কারণ হলো বার্ধক্য। তবে এর সঙ্গে আরও কিছু বিষয় জড়িত। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের অভাব, অর্থাৎ শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এই রোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পুষ্টিহীনতা, বিশেষ করে প্রোটিন ও ভিটামিন-ডি'র ঘাটতি সারকোপেনিয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া হরমোনজনিত পরিবর্তন, যেমন টেস্টোস্টেরন, গ্রোথ হরমোন ও ইনসুলিনের মাত্রা হ্রাস এই রোগের জন্য দায়ী হতে পারে।

ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি বা ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী রোগ, দীর্ঘদিন স্টেরয়েড বা কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ সেবন এবং শরীরে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ থাকলেও সারকোপেনিয়া দেখা দিতে পারে।

সারকোপেনিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। সাধারণ পেশিশক্তি কমে যাওয়া, শরীরের ওজন হ্রাস পাওয়া, বিশেষ করে মাংসপেশি শুকিয়ে যাওয়া, হাঁটার গতি ধীর হয়ে যাওয়া, অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়া এবং দৈনন্দিন কাজে অসুবিধা হওয়া এর প্রধান লক্ষণ। চেয়ার থেকে উঠতে, সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হওয়া, ভারসাম্য হারানো বা বারবার পড়ে যাওয়ার ঘটনাও এই রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়।

সারকোপেনিয়ার নির্দিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ নেই। তবে সঠিক জীবনযাপন ও চিকিৎসার সমন্বয়ের মাধ্যমে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং পেশিক্ষয় কমানো সম্ভব। এক্ষেত্রে ব্যায়াম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে স্ট্রেংথ ট্রেনিং ও রেজিস্ট্যান্স ব্যায়াম অত্যন্ত কার্যকর।

ওয়েট ট্রেনিং, রেজিস্ট্যান্স ব্যান্ড এক্সারসাইজ, স্কোয়াট, লাঞ্জ, পুশ-আপ, নিয়মিত হাঁটা এবং হালকা দৌড় পেশিশক্তি বাড়াতে সহায়ক।

পুষ্টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার, যেমন— মাছ, মুরগি, ডিম, ডাল ও দুধজাত খাবার নিয়মিত খেতে হবে। পাশাপাশি ভিটামিন-ডি, ক্যালসিয়াম, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ক্যালোরি নিশ্চিত করা জরুরি। প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটামিন-ডি, ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট নেওয়া যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী হরমোন থেরাপি উপকারী হতে পারে। মাংসপেশির শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন থেরাপি ও বিভিন্ন থেরাপিউটিক এক্সারসাইজও কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

সারকোপেনিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন অত্যন্ত প্রয়োজন। ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করতে হবে, পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হবে এবং নিয়মিত শরীরচর্চা ও সক্রিয় জীবনযাপন বজায় রাখতে হবে।

প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ৪০ বছর বয়স পার হওয়ার পর থেকেই নিয়মিত ব্যায়াম শুরু করা উচিত। প্রতিদিন শরীরের ওজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত প্রোটিন (প্রতি কেজি ওজনে ১-১.২ গ্রাম) গ্রহণ করা প্রয়োজন। হাড় ও পেশি শক্ত রাখতে ভিটামিন-ডি এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতি যেন না থাকে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং ফিজিয়োথেরাপিতে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় ক্ষয়ের পাশাপাশি মাংসপেশিও দুর্বল হয়ে পড়ে। শুরু হয় পেশির ক্ষয়। এটা বিশেষ করে বেশি হয় নারীদের। শরীরের এমন অবস্থাকে ১৯৮৮ সালে প্রথম নামকরণ করা হয় সারকোপেনিয়া। গ্রিক শব্দ 'সারকো' অর্থ মাংসপেশি ও 'পেনিয়া' মানে অভাব বা ঘাটতি থেকে এই নাম এসেছে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় উপকার হয়। ◻

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস : সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ

আশিস কুমার পাল

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৬৯তম সাধারণ সভায় ২১ জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের ২১ জুন প্রথম যোগ দিবস পালন হয়েছে সারা ভারতবর্ষ-সহ বিশ্বের অনেক দেশে। নিজ নিজ এলাকায় যোগ দিবস পালন হোক— এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আহ্বান করা হয়েছে।

'যোগ' ভারতবর্ষের ঋষি মনীষী ও যোগাচার্যদের দ্বারা মানুষের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভের যে সাধনা তারই সর্বজনগ্রাহ্যতা ও মান্যতার প্রমাণ। বিশ্ববাসী এই বিদ্যাকে সাদরে গ্রহণ করেছে।

যোগ শব্দটি যুজ ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ দুটি বস্তু বা বিষয়কে যুক্ত করা বা একত্র করা। প্রাচীন মুনি ঋষিদের মতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনই হলো যোগ। মহর্ষি পতঞ্জলিকে যোগের জনক বলা হয়। তিনি যোগ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, চিত্তের বৃত্তি সমূহকে নিরোধ করার নামই যোগ। সরলভাবে বলতে গেলে বলা যায় চিন্তাধারা ও কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেহ ও মনকে এক সুরে বেঁধে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলাই হলো যোগ।

সমাধি লাভই যোগের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে মহর্ষি পতঞ্জলি ৮টি ধাপের কথা বলেছেন।

১. **যম :** মন সম্পর্কিত বিষয়ের ৫টি ভাগ— (ক) অহিংসা, (খ) সত্য, (গ) অস্তেয়, (ঘ) ব্রহ্মচর্য, (ঙ) অপরিগ্রহ।

২. **নিয়ম :** শরীর সম্পর্কিত বিষয়ের ৫টি ভাগ— (ক) শৌচ, (খ) সন্তোষ, (গ) তপ, (ঘ) স্বাধ্যায়, (ঙ) ঈশ্বর অনুধাবন।

৩. **আসন :** নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে স্থিরভাবে সুখাসনে অবস্থান। এর মাধ্যমে দৈহিক সুস্থতা ও মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয়।

৪. **প্রাণায়াম :** শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রয়ণই হলো প্রাণায়াম। এর ফলে মন শান্ত হয়।

৫. **প্রত্যাহার :** ইন্দ্রিয় সংযমই প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে মনকে সংযত করা হলো প্রত্যাহার।

৬. **ধারণা :** গভীর মনোযোগকে বলা হয় ধারণা। নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি মনকে নিয়োজিত করা। অর্থাৎ বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করা।

৭. **ধ্যান :** ধারণার পর যখন মন দীর্ঘ সময় দেহের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে স্থির থাকে তাকে ধ্যান বলে। তখন মন আনন্দে ভরপুর থাকে।

৮. **সমাধি :** ধ্যান বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে তাকে সমাধি বলে। ধ্যানের চরম অবস্থায় মন ও আত্মা এক হয়ে যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, যোগ সাধনের চরম পর্যায় হলো সমাধি। সমাধি শব্দের অর্থ কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ এবং সুস্থ, সবল ও নীরোগ দেহে সুখী জীবনযাপন। এই সমাধি লাভের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ করতে হয়— যোগকে জীবনের অঙ্গ হিসেবে লক্ষ্য রাখতে হবে, কীভাবে একে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের সাধনা। মনে রাখতে হবে, যোগ মানে শুধু শরীর চর্চা নয়; শরীর, মন ও আত্মার সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিক সুস্থতা, মানসিক অশান্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করা। এটি নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরকে রোগমুক্ত রেখে কর্মক্ষমতা বাড়ানো যায়। তার ফলে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমিয়ে মন শান্ত ও স্থির হয় এবং আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তাই আজ বিশ্ববাসী যোগকে এত গুরুত্ব দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ইতিহাস : ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ভাষণ প্রসঙ্গে ২১ জুন দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের প্রস্তাব দেন। বিশ্বকল্যাণ ও শান্তির জন্য পরবর্তী প্রায় ৩ মাস পরে অর্থাৎ ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর সাধারণ সভায় ১৭৭টি দেশ সম্মতি দেয় ২১ জুন দিনটি যোগ দিবস হিসেবে। ২১ জুন দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বড়ো দিন। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ২১ জুন প্রথম যোগ দিবস পালন হয় দিল্লির রাজপথে ৩৫,৯৮৫ জন যোগপ্রেমী মানুষ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যা গিনেসবুকে রেকর্ড হয়েছে। সেই বছর সারা বিশ্বে এমনকী ৪৪টি ইসলামি দেশ-সহ ১৯২টি দেশ অংশগ্রহণ করে, যা বিশ্ব রেকর্ড।

যোগদিবসের প্রতি বছরে একটি থিম থাকে। যেমন গত বছরের থিম ছিল তা 'পৃথিবী এক স্বাস্থ্যের জন্য (২০২৫) যোগ।' এবছর ১২তম যোগ দিবসের থিম হলো 'সুস্থ প্রজ্ঞাময় বার্ধক্যের জন্য যোগ।'

এই থিমটি দৈহিক সুস্থতা, মানসিক, ভারসাম্য এবং বিশ্বজুড়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরুর আসনে বসানোর জন্য আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগদান করে নিজেদের যোগময় জীবন গড়ে তোলার আহ্বান।

যোগাসন

প্রকৃত যোগের পথে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যম

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সনাতন ভারতবর্ষের ঋষি-বিজ্ঞানীরা চাইতেন, মানুষ যেন এই নরলোকে বিচরণ করেও অমরলোকের স্বাদ পায়! বেদমন্ত্রের মধ্যে তাই দেখা যায় শত বসন্তের আবাহন। শুধু শত বসন্তের এই বেঁচে থাকার ইচ্ছা তাঁদের নিজ স্বার্থের জন্য নয়, তাঁরা চাইতেন বিশ্বের প্রতিটি মানুষ তাঁদের মতোই সুস্থভাবে জীবনকে ভোগ করে; তারা ভোগবাসনাকে অতিক্রম করে বাসনা ক্ষয়ের মাধ্যমে মোক্ষাবস্থা লাভ করুক। আর সেই কারণেই তাঁরা এমন কিছু পন্থা উদ্ভাবন করেন যা যোগবিজ্ঞান নামে পরিচিত।

দৃশ্যমান এই জগতের যা মূল উপাদান তা হলো ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। সম্পূর্ণ বিশ্বপ্রাণের বীজ এই পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সনাতনী ঋষিরা বুঝেছিলেন মানব শরীরও এই পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বের সমাহারে গঠিত। তাঁদের মননশীল অনুসন্ধিৎসায় তাঁরা জানতে পারেন মানব শরীরে এই পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বের ভারসাম্যই মানুষকে সুস্থ, নীরোগ ও দীর্ঘজীবন দান করতে পারে। যে দীর্ঘজীবনে মানুষ সুসংযত উপায়ে, বিধিসম্মত ভাবে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগের পর; ভোগকে অতিক্রম করে মোক্ষের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

শরীরকে সুস্থ ও নীরোগ রাখার উপায় হিসেবে তাঁরা দেখেছিলেন এক্ষেত্রে হটযোগের একটি বিশেষ স্থান আছে। যোগাসন আর প্রকৃত যোগ যদিও এক জিনিস নয়, তবুও শরীর যদি সুস্থ ও নীরোগ না থাকে তাহলে মানুষ যে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করে প্রকৃত লক্ষ্যে কোনোদিনই পৌঁছতে পারবে না, একথা তাঁদের অজানা ছিল না। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ না হলে প্রকৃত যোগ শুরুই হয় না! জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনই 'যোগ'। চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রাণকর্মের বা প্রাণায়ামের দ্বারা অন্তর্মুখী করে সকল মানসিক বৃত্তিগুলিকে রোধ করে, মনকে লয় করে পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলিত করতে পারলেই মুক্তি বা মোক্ষ! আর এই উত্তরণের পথ হিসেবে ভারতীয় ঋষিরা হটযোগের বা বিভিন্ন যোগাসন বা মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন যোগের নানান পন্থা, যেমন— লয়যোগ, রাজযোগ, বিহঙ্গযোগ, শিবযোগ, সিদ্ধযোগ, উদ্‌গীথযোগ, ক্রিয়াযোগ প্রভৃতি। এগুলির প্রতিটিই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের এক একটি

বিশেষ পন্থা; তার মধ্যে ক্রিয়াযোগ হলো প্রতিটি পথের কিছু বিশেষ পদ্ধতির মিলিত রূপ।

‘ক্রিয়া’ শব্দটি এসেছে ‘কৃ’ ধাতু থেকে, যার অর্থ কর্ম বা কোনো কাজ করা। তাই, ক্রিয়াযোগ মানে কোনো কাজ বা ক্রিয়ার দ্বারা পরমাত্মা বা নিজেকে বিশ্বাত্মা হিসেবে প্রতিভাত করা। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন— ‘এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি আগে সূর্যকে বলেছিলাম। পরে সূর্য নিজপুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। ইক্ষ্বাকু থেকে শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত এই ক্রিয়াযোগ অকৃত্রিম অবস্থায় থাকলেও কলির প্রভাবে ধীরে ধীরে তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের গুরুদেব মহাবতার বাবাজী মহারাজই এই ক্রিয়াযোগকে বহু যুগের ভুলে যাওয়া স্মৃতির পাতাল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে শিষ্য লাহিড়ীবাবার মাধ্যমে জগৎ-কে উপহার দেন। লাহিড়ী মহাশয় এর নাম দেন ‘সহজ ক্রিয়াযোগ’। যা তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে। লাহিড়ী মহাশয়ের প্রশিষ্য যোগানন্দজীর লেখায় দেখা যায়, বাবাজী মহারাজ লাহিড়ী মহাশয়কে দীক্ষা দেওয়ার পর বলছেন— ‘আজকে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তোমার হাত দিয়ে আমি জগৎ-কে যে ক্রিয়াযোগ দান করছি, তা হচ্ছে সেই একই বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাজার হাজার বছর আগে অর্জুনকে দিয়েছিলেন।’ যা মহর্ষি পতঞ্জলি, সন্ত ঈশাহীনাথ, কবীর প্রমুখ মহাপুরুষ জ্ঞাত হয়েছিলেন আপন আপন গুরুদের দ্বারা। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শিষ্য যোগানন্দজী বলে গেছেন— ‘‘সাড়ে আট ঘণ্টায় এক হাজার বার ‘ক্রিয়া’ যোগের অভ্যাস করলে পরে, একদিনে যোগীর এক হাজার বছরের স্বাভাবিক বিবর্তনের সমান উন্নতি সাধিত হয়’’ (যোগী কথামৃত-পৃ. ৩২৭)। অর্থাৎ এই স্বাভাবিক বিবর্তন মানে মানসিক উত্তরণের বিবর্তন! তাই যোগাসন ও বিভিন্ন মুদ্রাগুলি প্রকৃত যোগের পথে

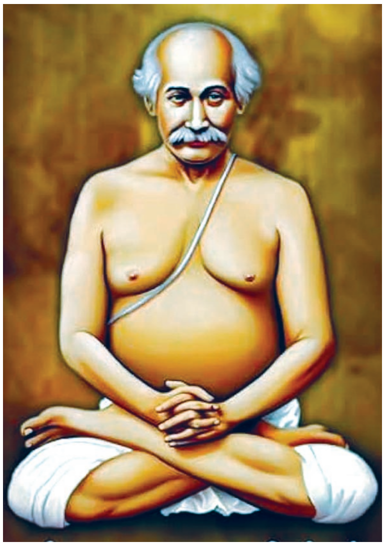

যোগীকে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

ভারতের উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন মণ্ডলের আলমোড়া জেলার দ্বারহাটের কাছে পাণ্ডুখোলি পাহাড়ে অবস্থিত বাবাজী মহারাজের গুহা; যা রানিক্ষেতের থেকে খুব একটা দূরে নয়। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর পৌত্র যোগাচার্য সত্যচরণ লাহিড়ীর শিষ্য যোগাচার্য বাচস্পতি অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়ের— ‘পুরাণ পুরুষ যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই গুহাতেই মহাবতার বাবাজী মহারাজ লাহিড়ীকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দেন। যা আজ বাবাজী মহারাজের গুহা নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষ যোগীর দেশ। ভারতবর্ষ অবতরণের মহাদিব্য ভূমি। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী অবতার শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে অবতরণ অর্থে— অব + তর + ঋ = অবতরণ। মহান দেবাত্মা যখন শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁকে বলা হয় অবতার। মরণজয়ী বাবাজী মহারাজও একজন অবতার। তাঁদের মূল কাজ মানুষের আধ্যাত্মিক উত্তরণে সাহায্য করা, জগৎকে রক্ষা করা, সভ্যতাকে এগিয়ে দেওয়া প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, পতঞ্জলি, চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতাররা বিশেষ ধর্মসংকটের সময় আবির্ভূত হন; আর, বাবাজী মহারাজের মতো অবতারেরা খুব কমই প্রকাশ্যে আসেন। তাঁরা মানবজাতির ক্রমোন্নতির জন্য হাজার বছর ধরে বিবর্তনকে সাধিত করার প্রয়াস করেন তাকে সঠিক পথে চালনা করা। যোগীরাজ লাহিড়ীর শিষ্য, পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্যের প্রশিষ্য অমল বিকাশ চৌধুরী বলতেন— ‘যখনই কেউ ভক্তিভরে বাবাজী মহারাজকে স্মরণ করে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তের উপর বাবাজীর আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।’

আদি শঙ্করাচার্য তাঁর ‘বৈরাগ্যশতক’-এ লিখেছেন— ‘জীবাত্মা ও পরমাত্মা, উভয়ের মধ্যে অভেদজ্ঞান না জন্মালে শুধুমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞানতার নাশ ঘটে না। কেবল আত্মোপলব্ধি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, একমাত্র সেটার দ্বারাই অজ্ঞানতার নাশ ঘটে।’ তাই ঋষিরা অজ্ঞানতার নাশ ঘটিয়ে আত্মোপলব্ধির উপায় হিসেবে যোগবিস্তার উদ্ভাবন করে গেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন— ‘কঠোর তপঃনিরত তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানযোগী বা কর্মযোগী অপেক্ষাও নিষ্কাম কর্মযোগী বা যোগী শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও!’

ক্রিয়াযোগ হচ্ছে সেই অদ্বৈততত্ত্বের অগ্নিযজ্ঞ যেখানে যোগী তার আত্মোপলব্ধির জ্ঞানসূর্যের বিশুদ্ধ কিরণে শুদ্ধ হয়ে, সকল কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসীম ব্রহ্মানন্দে চির লীন হয়ে যেতে পারেন। মুক্ত আত্মায় পরিণত হয়ে যুক্ত হতে পারেন বিশ্ব আত্মার সঙ্গে। স্থির প্রাণে চঞ্চলতার অবসানে পঞ্চভৌতিক এই দেহের ভূতশুদ্ধি ঘটে। জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে চলে গিয়ে ‘নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে’ এই অবস্থায় অবস্থান করতে সক্ষম হন যোগী। একেই বলে অমরত্ব প্রাপ্তি। এই অবস্থায় যোগী যখন উপনীত হন তখন তিনি নিজেই ভগবান হয়ে যান! তাই, যে পদ্ধতি বা পথ অবলম্বন করলে জীবাত্মা পরমাত্মায় উন্নীত হতে পারেন সেটাই স্বধর্মের পথ, সেই কর্মই স্বধর্ম। সেটাই সনাতন! ■

প্রতিবেদন

কলকাতায় উদ্‌যাপিত হলো 'আন্তর্জাতিক যোগ

গত ১৯ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ত্রি-দিবসীয় 'বন্দে যোগম্' উৎসব। ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতিপর্বে গত ১৯ জুন দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয় 'দৌড় থেকে ধ্যান-২০২৬— ফ্রম মুভমেন্ট টু স্টিলনেস্' কর্মসূচি। এদিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় অনুষ্ঠিত হয় 'রান ফর যোগ'। 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৬'-এর প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ ছিল এই অনুষ্ঠানটি, যা যোগব্যায়াম সম্পর্কে জনসচেতনতা ও মানুষের অংশগ্রহণকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। 'দৌড় থেকে ধ্যান'-এর বার্তাটি যোগব্যায়ামের মূল তত্ত্বকেই প্রতিফলিত করে, অর্থাৎ গতিকে স্থিরতায়, শৃঙ্খলাকে ভারসাম্যে এবং সম্মিলিত প্রয়াসকে সামগ্রিক সুস্থতার পথে যাত্রায় রূপান্তর। 'স্বচ্ছতার দ্বারা স্বাগত' প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত এই প্রশাসনিক প্রয়াসটি জনস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, নাগরিক দায়িত্ববোধ ও সামগ্রিক সমৃদ্ধির মূল্যবোধসমূহকে একসূত্রে গেঁথেছে। কলকাতা পুরসভার সদর কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে দু'কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ের শুভারম্ভ করেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রতাপরাও যাদব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, বিধায়ক বিজয় ওঝা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব ড. মনোজ কুমার আগরওয়াল, আয়ুষ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা, প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ প্রমুখ বিশিষ্টজন। 'রান ফর যোগ'-এর নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এসএন ব্যানার্জি রোড, ধর্মতলা, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট হয়ে ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিঙে পৌঁছে এই দৌড় শেষ হয়।

ম্যারাথন শেষে রাইটার্স বিল্ডিঙের সামনে যোগব্যায়াম ও ধ্যানের একটি পর্ব আয়োজিত হয়, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও সুস্থতার বার্তা তুলে ধরা হয়। মহাকরণের সামনে যোগ-অনুশীলন কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে কলকাতার ১১টি স্থানে একই সময়ে দু'কিলোমিটারের একটি 'যোগ দৌড়'-এর আয়োজন করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল নাগরিকদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসেবে যোগব্যায়ামকে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। এদিনের দৌড় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করে এবং শারীরিক সক্রিয়তা থেকে মননশীলতা ও ধ্যানের দিকে যাত্রার বিষয়টি তুলে ধরে। পিএসি টেন্ট ময়দান, ইলিয়ট পার্ক, আরএসএম স্কোয়ার (সেন্ট্রাল), টালা পার্ক (বেলগাছিয়া), সুভাষ সরোবর (বেলেঘাটা), ক্যাপ্টেন ভেরি (ইএম বাইপাস), গোলপার্ক (বিবেকানন্দ পার্ক), গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম (কসবা), কেএফআর গ্রাউন্ড (বেহালা), সঙ্ঘমিত্রা স্কুল প্লে-গ্রাউন্ড (ওয়েস্ট পোর্ট) ও চণ্ডীপুরা রংসাড়া মাঠ (ভাঙড়)-এর মতো স্থানগুলি থেকে এই 'যোগ দৌড়' অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য মানুষ এই দৌড় ও যোগব্যায়াম পর্বে যোগদান করেন, যা এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্দীপনাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে এবং অন্যান্যদেরও অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণা দেয়।

যোগেই সব রোগের বিয়োগ। যোগ দিবসকে সফল করার লক্ষ্যে ১৯ জুন সারা দেশের সঙ্গে দুর্গাপুরে উদ্‌যাপিত হয় 'রান ফর যোগ' ও 'ওয়াক ফর যোগ'। বৃষ্টি উপেক্ষা করে এই 'রান ফর যোগ'-এর ম্যারাথনে উপচে পড়ে ক্রীড়াপ্রেমী ও যোগানুশীলনকারীদের ভিড়। এদিন দুর্গাপুরে শারীরিক- মানসিক সুস্থতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বার্তা দিতে উদ্‌যাপিত হয় উপরোক্ত কর্মসূচি। ম্যারাথন, ওয়াক ও যোগ-ক্যাম্প আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় যোগচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং দৈনন্দিন জীবনে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা।

দিবস— ২০২৬'

এদিন দুর্গাপুর এডিডিএ ভবনের সামনে থেকে 'রান ফর যোগ'-এর সূচনা হয়। শেষ হয় বিপ্লবী ভগৎ সিংহ ক্রীড়াঙ্গনে। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা সম্মিলিতভাবে ধ্যানস্থ হন। 'ওয়াক ফর যোগ' কর্মসূচিতে যোগদান করেন দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর পুরসভার কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলাম, কমনওয়েলথ গেমস্-এ সোনাজয়ী পাওয়ার লিফ্টার সীমা দত্ত, দুর্গাপুর সাব-ডিভিশনাল যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তরুণ মুখোপাধ্যায়-সহ অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। সরকারি আধিকারিকরা জানান যে, দুর্গাপুরে 'যোগ দিবস'-এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। দু'টি স্থানে এই কর্মসূচি ভাগ করা হয়েছে— সিটি সেন্টারে সিধু-কানহু স্টেডিয়াম ও নেহরু স্টেডিয়াম। স্থানীয়দের মধ্যে খুব ভালো সাড়া পড়েছে।

ফ ঃ ৪

সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যোগ

'হুগলী কালচারাল যোগ কার্নিভাল'

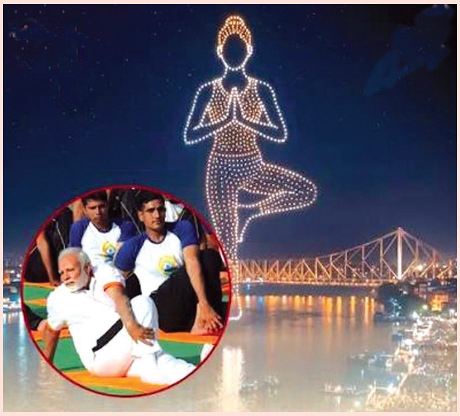

২০ জুন সন্ধ্যায় কলকাতায় গঙ্গাতীরে প্রিন্সেপ ঘাট ও মিলেনিয়াম পার্কে আয়ুষ মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'হুগলী কালচারাল যোগ কার্নিভাল'। এই উৎসবের মাধ্যমে একই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয় 'বন্দে যোগম্' ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস। এই উৎসব উপলক্ষ্যে এদিন আলোকমালায় সজ্জিত হয় অনুষ্ঠানস্থলগুলি। বাউল শিল্পীদের পরিবেশিত লোকগান, স্যান্ড আর্ট, চিত্রকলা প্রদর্শনী, 'পেন্ট ইট, ক্লিক ইট' প্রতিযোগিতা, ফোটো-বুথ, লেজার শো, ফুড স্টল-সহ অগণিত মানুষের জনসমাগমে এদিনের উৎসব হয়ে ওঠে রীতিমতো জমজমাট। '১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর বার্তা হিসেবে তুলে ধরা হয় 'সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যোগ'-শীর্ষক থিম। গঙ্গাতীরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাত্রি ৮টায় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিন হাজার ড্রোন-সৃষ্ট একটি 'মেগা ড্রোন শো'। ভারতীয় যোগানুশীলন, বিভিন্ন যোগাসন, যৌগিক ক্রিয়াকৌশল, যোগশাস্ত্র-বর্ণিত সুষুম্নাকাণ্ড-স্থিত সাতটি প্রধান শক্তিকেন্দ্র বা চক্র, ভারতবর্ষ ও বঙ্গভূমির সঙ্গে 'যোগ'-এর চিরন্তন বন্ধন, ভারতীয় যোগাচার্য ও দেশবরেণ্য মনীষীদের প্রতিকৃতি— এদিন ড্রোন শো-এর মাধ্যমে সাতটি বর্ণের আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণের

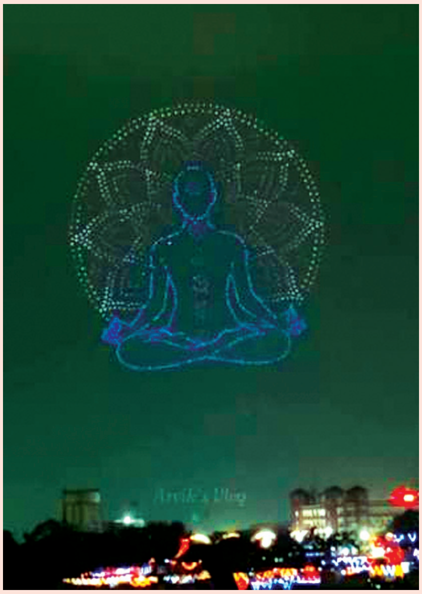

দ্বারা রাত্রিকালীন অন্ধকার আকাশে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই ড্রোন শো-এর মাধ্যমে ভারতীয় যোগাচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। বাবুঘাট ও বেলুড় মঠ থেকেও এই ড্রোন শো দৃশ্যমান হয়।

'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর প্রাক্কালে গঙ্গাতীরে জমকালো আয়োজন আর ড্রোন শো রীতিমতো চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। গঙ্গার ঘাট থেকে নিয়ন আলোয় সজ্জিত হাওড়া ব্রিজের দু'পারে যে বিশ্বমানের দৃশ্যমান জাদু এদিন শহরবাসী দেখলেন, তা ভারতের 'সফ্ট পাওয়ার'-এর প্রদর্শন রূপে বর্ণনা করছে বিশেষজ্ঞ মহল। তাঁদের মতে, সাম্প্রতিক ড্রোন শো একটি নতুন দিগন্তের ইশারা। 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' উদ্‌যাপনের এই সাফল্য প্রমাণ করেছে যে, আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পুরোপুরি প্রস্তুত কলকাতা।

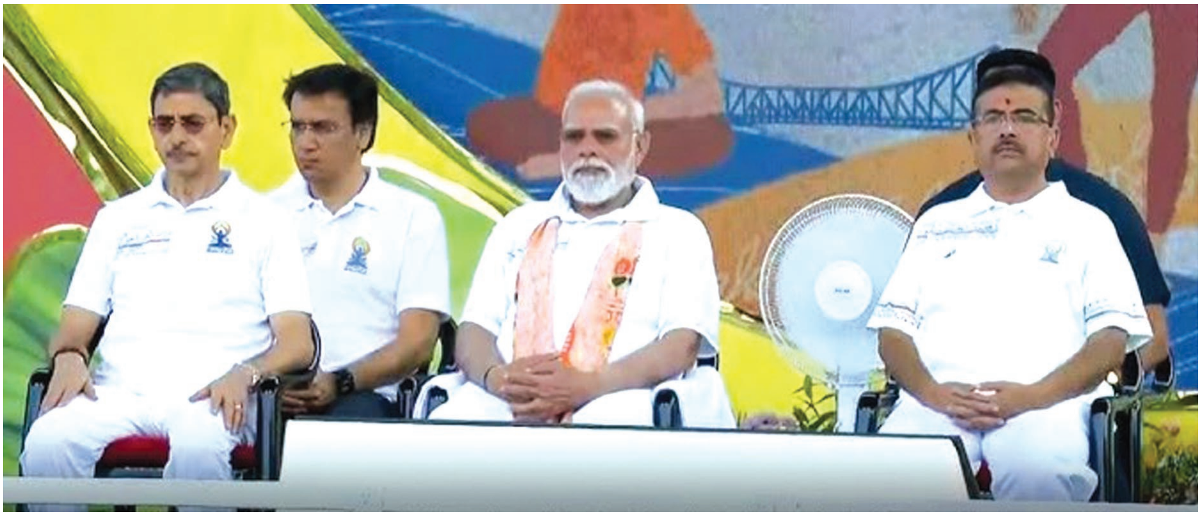

‘বয়সকালে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে যোগ’

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বললেন প্রধানমন্ত্রী

২১ জুন ‘১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস’ উদ্‌যাপনের জন্য ভারত সরকার ঘোষিত হোস্ট সিটি ‘কলকাতা’ হওয়ার দরুন গোটা দেশ ও সমগ্র বিশ্বের নজর ছিল পশ্চিমবঙ্গের ওপর। এদিন রেড রোডে বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় যোগ দিবসের বিশেষ কর্মযজ্ঞ। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বঙ্গভূমি হলো ‘যোগভূমি’। যোগ দিবসের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম আয়োজনের মাধ্যমে এরাজ্যে যোগানুশীলনের চর্চা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘যোগ’ ভারতের বহু পুরোনো সংস্কৃতি হলেও পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের তোষণের রাজনীতি ও গোপন অ্যাজেন্ডার

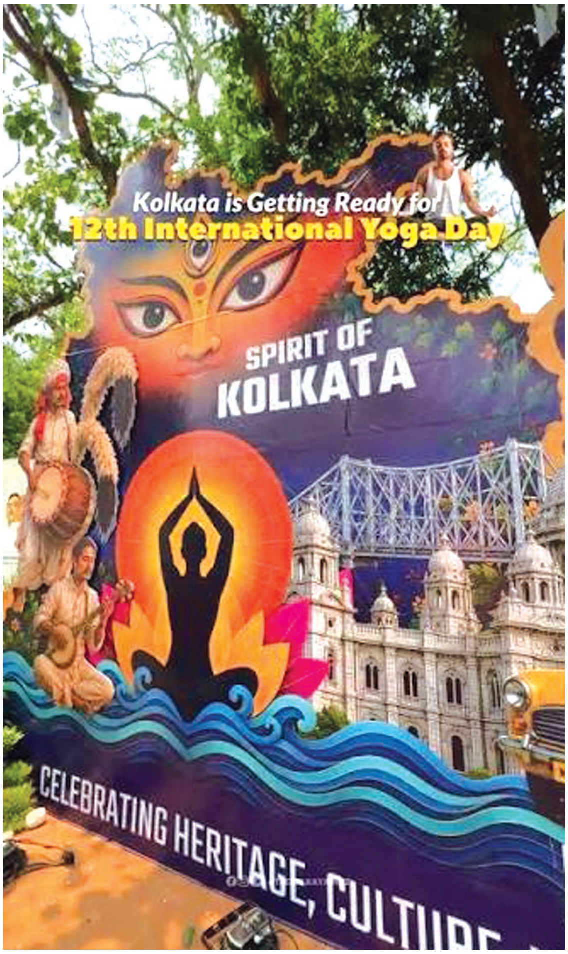

কারণেই এতদিন পশ্চিমবঙ্গে সরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপিত হয়নি। এর ফলে রাজ্যবাসী কেন্দ্রের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ থেকে বঞ্চিত থেকেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, পূর্বতন সরকারের আমলে তুষ্টীকরণের রাজনীতির কারণেই এরাজ্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য যোগচর্চাকে পরিকল্পিতভাবে অবহেলা করা হয়। তবে রাজ্যবাসীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে এই বছর রাজ্যজুড়ে এই যোগ-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীজীর হাত ধরেই এই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য আবার এরাজ্যে ফিরে এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আবেগপ্রবণ কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে এই হারিয়ে যাওয়া এবং দীর্ঘকাল ভুলিয়ে রাখা যোগ সংস্কৃতিকে ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সরকারি কর্মীদের সর্বাত্মক উপস্থিতি এবং বিভিন্ন

সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবারের যোগ দিবস এক ব্যাপক জনসমাগমে পরিণত হয়েছে।

২০১৫ সালে আর্ন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্যাপন শুরু হওয়ার পর এই প্রথমবার এত বড়ো পরিসরে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দিনটি রাজ্যে উদ্যাপিত হলো।' এরপর মঞ্চে বক্তব্য রাখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে যোগের উপকারিতার বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন। 'যোগ' কীভাবে শরীরকে শান্ত রাখে, মনকে একমুখী করে, জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে, সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বয়সকালে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে যোগ। প্রত্যহ যোগাভ্যাস করলে মন শান্ত থাকে, উদ্বেগকে দূরে রাখা যায়।' তিনি তাঁর বক্তব্যে এদিন উপস্থাপন করেন ইতিহাস। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের পুণ্যভূমিতে যোগ দিবস উদ্যাপন একটি বড়ো প্রাপ্তি। কলকাতাবাসী স্বচ্ছতার সঙ্গে দিনটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। যোগে কোনো বয়সের সীমা থাকে না। যোগ দিবস দেশজুড়ে তুলে ধরেছে ঐক্যের ছবি। যোগ— মানব জীবনের চেতনার প্রকাশ। সকলকে জুড়ে দিয়েছে যোগ দিবস। গোটা দেশ এক হয়েছে। ২১ জুন দিনটি বিশ্বের অন্যতম উৎসবের রূপ নিয়েছে।'

যোগের উপকারিতার বিষয়ে তিনি বলেন, 'যোগ দুঃখের বিনাশ করে। যোগ জীবনের ভারসাম্য শেখায়। কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়, তা শেখায় যোগ। যখন আমরা শরীরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে শিখে নিই, তখন সুস্বাস্থ্য সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকে। যোগ শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে না, মানসিক স্বাস্থ্য থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথপ্রদর্শন করে।' মহর্ষি পতঞ্জলি, মহাবতার বাবাজী মহারাজ, যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ, পরমহংস যোগানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষ ও যোগাচার্যদের এদিন স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গভূমির সঙ্গে যোগ এবং ঈশ্বরকোটির যোগাচার্যদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন তিনি। এদিন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছিল রেড রোড।

যোগ দিবসের কার্যক্রমে যোগদানের জন্য 'যোগ-সঙ্গম' পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের সদস্য-সদস্যা, প্রাতর্ভ্রমণকারী ও সাধারণ মানুষের ভিড়ে ঠাসা ছিল রেড রোড। নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্য রাখার পর তিনি সরাসরি চলে যান সাধারণ মানুষের মাঝে। জনসাধারণের মধ্যে, রাস্তায় পাতা ম্যাটে বসে বিভিন্ন যোগাসন ও প্রাণায়াম করেন তিনি।

এরপর কলকাতার লোকভবনে আয়োজিত যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানেও যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। রেড রোডের এই যোগ উৎসব পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক মানচিত্র ও জনমানসে নতুন এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা যোগ দিবসের এই সাফল্যকে রাজ্যের সুস্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের প্রতীক রূপে দেখছেন। ২১ জুন সকালে হুগলী নদীতে ৫০০টি নৌকায় সওয়ার হয়ে যোগানুশীলনকারীরা বিভিন্ন যোগাসন প্রদর্শন করে 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' স্থাপন করেন। ■

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

রবিব্রত ঘোষ

স্নানযাত্রা পর্ব প্রভু জগন্নাথদেবের সঙ্গে সংযুক্ত। জগন্নাথ অর্থাৎ জগতের প্রভু বা জগতের নাথ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের আরেকটি রূপ। শ্রীজগন্নাথ কিন্তু একা পূজা পান না। তাঁকে, অগ্রজ বলরাম ও ভগ্নী সুভদ্রার সঙ্গে পূজা করা হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে একাধিক কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। একটি কাহিনি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ভেসে আসা একটি কাঠকে দেখিয়ে তাঁর মূর্তি তৈরির স্বপ্নাদেশ দেন। রাজার প্রচেষ্টায় এবং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার কলাকৌশলে দেবত্রয়ীর মূর্তি নির্মিত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির নির্মিত হয় সমুদ্র-তীরবর্তী শ্রীক্ষেত্র বা পুরীতে। ওড়িশার উৎকল খণ্ড এবং দেউল তোলা নামে একটি পুঁথি অনুসারে প্রাচীনকালে অবন্তীনগর রাজ্যের বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন এই ইন্দ্রদ্যুম্ন।

প্রতিবছর সাধারণত অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। শিরঃপীড়ার উপশমের জন্য তাঁর কপালে মোটা করে চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই প্রলেপ তোলা হয় রথযাত্রার ১৫ দিন আগে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠানে।

মূলত প্রভু শ্রীজগন্নাথের 'স্নানযাত্রা উৎসব' হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আয়োজিত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তদের কাছে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম— শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠানের মূলকেন্দ্র। অবশ্য শুধু পুরীই নয়, দেশের অন্যান্য প্রান্তেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উদ্‌যাপিত হয় মহাসমারোহে।

স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ডের 'শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য' অংশ থেকে জানা যায় যে, মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু প্রসন্ন হয়ে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় তিনি দারুব্রহ্ম রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে এই দিনটি তাঁর জন্মতিথি এবং এই দিনে তাঁর মহাস্নান হবে।

ব্রহ্মপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, পদ্মপুরাণ, কপিল সংহিতা, যাত্রা ভাগবত এইরকম প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে এ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষত স্কন্দ পুরাণের 'শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য' অংশে স্নানযাত্রা সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা রয়েছে (৩১।২৬-৯৭)।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান মণ্ডপটি প্রথমে নির্মাণ করেছিলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বয়ং। পরবর্তীকালে এই মঞ্চের অবস্থা জীর্ণ হয়ে গেলে রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের আমলে নতুনভাবে তৈরি করা হয়।

তারপরে রাজা কপিলেন্দ্রদেবের আমলে মন্দিরের চারধারে প্রাচীর ও বর্তমানের উঁচু স্নান মণ্ডপটি নির্মাণ করা হয়।

স্কন্ধ পুরাণে উল্লেখিত হয়েছে যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে বলছেন— 'সমুদ্র

তীরে অক্ষয় বটের উত্তরে একটি কুয়োতে সর্বতীর্থের জল রয়েছে। কিন্তু কুয়োটি বালিতে ঢাকা পড়ে গেছে। শ্রীক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমি এই কুয়োটি খনন করিয়েছিলাম। এখন তার পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের প্রয়োজন।' এর থেকে বোঝা যায়, লীলাময় প্রভু তাঁর আবির্ভাবের আগেই স্নানযাত্রার পটভূমি তৈরি করে রেখেছিলেন।

শ্রীভগবান আরও বলেন, 'রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিকপালদের পূজা করে চতুর্দশীর দিন কুয়োটির সংস্কার করবে। ব্রাহ্মণরা স্বর্ণকলসে জল তুলে রাখবে। সেই জলে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার সকালে আমাদের স্নান হবে।'

শ্রীমন্দিরের ভাষায় এর নাম প্রণীতাকূপ। ভক্তদের কাছে এটি সোনার কুয়ো নামে পরিচিত। বিশ্বাস করা হয় এই কুয়োটি দেবীর বাহন সিংহ পাহারা দেয়। স্নানযাত্রার আগের দিন কুয়োটিকে সংস্কার করে জলশূন্য করা হলেও পরদিন সেটি আবার জলপূর্ণ হয়ে ওঠে।

স্নানযাত্রার দিন সেবকেরা ১০৮টি সোনার কলসিতে জল তুলে রাখেন। এরপর এই জলে ত্রিফলা, অগুরু, ঘি, মধু, চন্দন, কস্তুরী, কর্পূর--- এইরকম ১৩টি জিনিস মেশানো হয়। তারপর এই ১০৮টি কলসকে যোড়শোপচারে পূজা করা হয়।

বলভদ্রকে ৩৩, শ্রীজগন্নাথকে ৩৫, সুভদ্রাকে ২২ ও সুদর্শনকে ১৮ কলসি জলে স্নান করানো হয়।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা দর্শনের মাধ্যমেই জীবের মুক্তি লাভ হতে পারে। এমনকী কেউ যদি ভক্তিসহকারে একবারও স্নানযাত্রা মহোৎসব দর্শন করেন, তাঁর সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত হয়ে যায়। পূর্ব মীমাংসা সূত্র রচনাকার জৈমিনী ঋষি, স্নানযাত্রার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ভগবান পুরুষোত্তমের স্নানযাত্রা দর্শন করলে জীব তীর্থসমূহে স্নান করার থেকে শতগুণ অধিক ফল লাভ করে। তিনি আরও বলেছেন যে, যদি কেউ আন্তরিকতার সঙ্গে স্নানকালে শ্রীভগবানকে নিরীক্ষণ করে, তাঁকে আর জন্ম নিতে হয় না।

পুরীধামে স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বিগ্রহ, সুদর্শন চক্র ও মদনমোহন বিগ্রহকে শ্রীমন্দির থেকে স্নানবেদীতে আনা হয়। সেখানে তাদের প্রথাগতভাবে স্নান করানো হয় এবং ভক্তদের দর্শনের জন্য সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করা হয়। প্রভু শ্রীজগন্নাথের ভক্তদের বিশ্বাস যে, সেদিন যদি কেউ পুরীর শ্রীমন্দিরে দেবদর্শন করতে যান, তবে তাঁরা সকল পাপ হতে মুক্ত হতে পারবেন। এই জন্য অসংখ্য ভক্ত স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরীর শ্রীমন্দির দর্শনে যান। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে পুরীর শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

আগের দিন সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন চক্র, মদনমোহন বিগ্রহকে একটি বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বার করে স্নানবেদীতে রাখা হয়। ভক্তরা এই সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করতে আসেন। স্নানযাত্রার দিন চন্দন, আতর-সহ বিভিন্ন সুগন্ধি মিশিয়ে পবিত্র জল এনে রাখা হয় স্নানবেদীতে। সুগন্ধি ধূপ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয় স্নানমঞ্চ।

এই জল আনেন প্রভু শ্রীজগন্নাথের সেবকরা। তাঁরা এই সময় নিজেদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন। সেই জল সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত করে 'পাবমানী' মন্ত্রে সোনার কলসে পরিপূর্ণ করে অধিবাস করা হয় গর্ভ মন্দিরে। এরপর শুরু হয় শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে স্নানমঞ্চে নিয়ে আসার প্রস্তুতি। সুন্দর পট্টবস্ত্র দিয়ে ঢেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে আসা হয় স্নানমঞ্চে। নিয়ে আসার সময় চামর ও তালপাতা দিয়ে বাতাস করা হয়। শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢাকা হয়। তারপর লাল রঙের এক ধরনের পাউডার দিয়ে প্রলেপ করা হয়। এরপর জলাভিষেকের সময় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, কীর্তন ও শঙ্খ বাজানো হয়। প্রভু যখন স্নান করেন চাহনি মণ্ডপ থেকে তা দেখেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মী মাতা। সকলে যাতে 'স্নান'-এর অনুষ্ঠান দর্শন করতে পারেন সেজন্য পুরীর শ্রীমন্দিরে একটি উঁচু বেদী তৈরি করা হয়েছে। যাতে পুরীর প্রশস্ত রাজপথ থেকেও প্রভুর স্নানযাত্রা প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশেষে মহাসমারোহে ভোরবেলা ব্রহ্মার সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার স্নান সম্পূর্ণ হয়।

এদিন সন্ধ্যাবেলায় স্নানপর্বের সমাপ্তির পর শ্রীজগন্নাথ ও বলভদ্রকে গণেশের রূপে সাজানোর জন্য হস্তীমুখ বিশিষ্ট একটি মস্তক আবরণী পরানো হয়। শ্রীজগন্নাথের এই রূপটিকে বলা হয় গজবেশ।

এর পিছনেও একটি কিংবদন্তী রয়েছে। গণপতি ভট্ট দক্ষিণ ভারতের এক বিখ্যাত ভক্ত সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পরম ব্রহ্মের দর্শন করলে জীব মোক্ষলাভ করে। শাস্ত্রে তিনি পড়েন যে পরম ব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ পুরীধামে বাস করেন। কিন্তু কোথা থেকে যেন তাঁর মনে এই ধারণা গেঁথে গিয়েছিল যে পরম ব্রহ্মের শুঁড় আছে। তাই, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীভগবানের দর্শন করতে এসে যখন তিনি দেখলেন যে ভগবান শ্রীজগন্নাথের শুঁড় নেই, তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে তিনি পরম ব্রহ্ম হতে পারেন না।

গণপতির এই দৃশ্য দেখে ভগবান শ্রীজগন্নাথ দুঃখিত হলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণের রূপ ধরে তাঁর কাছে এলেন। ভগবান তাঁকে বোঝালেন। ব্রাহ্মণের রূপ ধরে শ্রীভগবান গণপতি ভট্টকে ফিরে গিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন দেখলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীজগন্নাথ ও বলদেবের মাথা হাতির এবং তাঁদের শুঁড় ও দাঁত হাতির মতোই লম্বা। তখন গণপতি ভট্ট বিশ্বাস করলেন যে, শ্রীজগন্নাথই একমাত্র পরম ব্রহ্ম।

তিনি আরও স্বীকার করলেন যে, শ্রীজগন্নাথই ভগবান। তখন থেকে প্রত্যেক স্নানযাত্রার সন্ধ্যায় 'গজবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। ভগবান শ্রীজগন্নাথ ও বলদেবকে হস্তীরূপে এবং সুভদ্রাকে পদ্মরূপে সজ্জিত করা হয়।

স্নানযাত্রার প্রথম পর্ব মঙ্গলা পর্ণা যা রাত দু'টোর সময় শুরু হয়। এরপর হরিবেশ, যা বারোটায় শুরু হয়। তারপর বহুধা পাহাড়ি— বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মহাস্নানের পর তার অঙ্গরাগবিহীন রূপ যেন কেউ না দেখে। তাই

স্নানযাত্রার পর থেকে ১৫ দিন পুরীর শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা হয়। ১৫ দিন পর আবার পুরীর মন্দিরের দরজা খোলা হয় নয়ন কল উৎসবের মধ্য দিয়ে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সাজানোও হয়।

একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে, একবার শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা দেবকী ও বসুদেবের বাসনা হলো তীর্থস্নান করার। কুরুক্ষেত্র তীর্থে অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণে স্নান করলে মোক্ষলাভ হয়, তাই তারা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে আসেন কুরুক্ষেত্রের তীর্থে স্নান করানোর জন্য। সেই স্নান করার স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার আয়োজন এমনটি একটি উপাখ্যানও রয়েছে।

প্রথাগত বিশ্বাস অনুসারে, স্নানযাত্রার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জ্বর আসার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় তাঁকে রাজবৈদ্যের চিকিৎসাধীনে গোপন একটি ঘরে সুরক্ষিত রাখা হয়। এই সময় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী মাতাও প্রভুর সেবা দায়িত্ব নেন। প্রভুর সারা শরীরে চন্দন লেপে চিকিৎসা করা হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই অসুস্থতার পর্বটি 'অনসর' নামে পরিচিত। এই সময় ভক্তরা দেবতার দর্শন পান না। তার পরিবর্তে মূল মন্দিরে তিনটি পটচিত্র রাখা হয়। এ সময় ভক্তরা ব্রহ্মগিরিতে অলরনাথ মন্দিরে যান। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, শ্রীজগন্নাথ এখানে 'অলরনাথ' রূপে অবস্থান করছেন। কথিত যে, রাজবৈদ্যের আয়ুর্বেদিক পাচন খেয়ে একপক্ষ কালের মধ্যেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুস্থ হয়ে ওঠেন। তারপর আবার তাঁকে ভক্তরা দর্শন করতে পারেন। প্রভু শ্রীজগন্নাথ তাঁর মাসিকে দর্শন ও স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে শ্রীগুণ্ডিচা বাড়িতে যান। সেটাই প্রভু শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামপুরের কাছে মাহেশের স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান খুব বিখ্যাত। এদিন শ্রীজগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে ২৮ ঘড়া জল দিয়ে স্নান করানো হয়। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে দুধ ও গঙ্গাজল। বিশ্বাস করা হয় এর ফলে জ্বর হয় দেবদেবীর। তাই স্নানযাত্রার পর তিন বিগ্রহকে কম্বলে মুড়িয়ে রাখা হয়। ধীরে ধীরে তাদের জ্বর কমে। স্নানযাত্রার

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মহাস্নানের পর তার অঙ্গরাগবিহীন রূপ যেন কেউ না দেখে। তাই স্নানযাত্রার পর থেকে ১৫ দিন পুরীর শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা হয়। ১৫ দিন পর আবার পুরীর মন্দিরের দরজা খোলা হয় নয়ন কল উৎসবের মধ্য দিয়ে।

কয়েকদিন পর হয় অঙ্গরাগ উৎসব। তখন এই বিগ্রহগুলিকে রং করা হয়। এরপর হয় 'নবযৌবন উৎসব'। রথযাত্রার একদিন আগে রাজা হিসেবে অভিষেক হয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের।

ইসকনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ১০৮টি তীর্থের জল, দুধ, মধু-সহ বিভিন্ন রকমের ফলের রস দিয়ে স্নান করানো হয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে। এরপর দেওয়া হয় ৫৬ ভোগ। স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে কয়েকদিন আগে থেকেই ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে মায়াপুরে। এই সময় ভজন-কীর্তন ছাড়াও ভাগবত কথা পাঠ ও আলোচনা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে গুপ্তিপাড়া তার সুউচ্চ রথের জন্য পরিচিত। এখানে বেশ কয়েকটি শতবর্ষী মন্দির রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বৃন্দাবন চন্দ্র মঠ, যা আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে একটি সংরক্ষিত স্থান।

মন্দিরগুলো একটি প্রাচীরঘেরা চত্বরে অবস্থিত, যার উত্তর-পূর্ব কোণে স্নানমঞ্চটি রয়েছে। এটি একটি উঁচু মঞ্চ যার উপরে একটি চাঁদোয়া রয়েছে এবং একটি সরু সিঁড়ি দিয়ে সেখানে পৌছানো যায়।

স্নানযাত্রা অনুষ্ঠানের আগে পুরোহিতরা মূর্তিগুলি প্রস্তুত করেন। স্বেচ্ছাসেবকরা ফুল দিয়ে স্নান মঞ্চ সাজিয়ে প্রস্তুত করেন। আরেকটি দল গঙ্গাজলে দুধ মিশিয়ে এবং সামান্য ফুল যোগ করে পবিত্র পূজার জল প্রস্তুত করে।

গুপ্তিপাড়ায় স্নানযাত্রার আচার-অনুষ্ঠান দুপুরে শুরু হলেও ভক্তরা এক ঘণ্টারও বেশি আগে সেখানে এসে পৌছান। তাঁরা কীর্তন গেয়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

এক এক করে মূর্তিগুলিকে মন্দির থেকে স্নানমঞ্চে আনা হয়। সুভদ্রার প্রতিমা একজন ব্যক্তি বহন করে নিয়ে আসেন।

এরপর কমপক্ষে তিনজন লোক বলরামকে নিয়ে আসেন। তারপরে চার বা ততোধিক লোকের কাঁধে করে শ্রীজগন্নাথের বিশাল কালো মূর্তিটি আসে। অবশেষে, মূর্তিগুলিকে স্নানমঞ্চে রাখা হয় এবং আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়। ২৮ বা ২৯টি ছোটো মাটির কলসির জল দেবমূর্তির উপর ঢালা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় এইসময় 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা' উপলক্ষ্যে মেলা বসে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো— নদীয়া জেলার অন্তর্গত নাকাশিপাড়া থানার গেটপাড়া গ্রামে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে গোপীনাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব ও মেলা। নদীয়া জেলা চাকদহ থানার যশড়া গ্রামে বুড়োমা'র পূজা, উৎসব ও মেলা। মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানায় রামপাড়া গ্রামের ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষ্যে মেলা এবং শ্রীপাট যশড়া গ্রামে স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত জয়নগরে জয়চণ্ডী দেবীর ১৫ দিনব্যাপী মেলা ও উৎসব। বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার মালিয়ারা গ্রামে চণ্ডী দেবীর মেলা। বসিরহাট থানার শিবহাটি গ্রামের চতুর্ভুজ সিংহবাহিনী দেবীর পূজা ও মেলা। ফলতায় জগন্নাথপুর গ্রামে স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব ও মেলা। □

পাথরের পাতায় খোদিত বৈজ্ঞানিক মহাকাব্য

কোনার্ক সূর্যমন্দির

জীতেন্দ্র নাথ ঘোষ

একথা সত্য যে, অনাদিকাল পূর্বে ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের পত্তন হয়েছিল। কালক্রমের ক্রমবিকাশে হরপ্পা-মহেঞ্জদাড়ো (সিন্ধু-সরস্বতী) সভ্যতা থেকে মৌর্যযুগ, কুষাণযুগ, গুপ্তযুগ, উত্তর ও পূর্ব ভারতের পাল, সেন সাম্রাজ্য, দাক্ষিণাত্যের পল্লব, চোল সাম্রাজ্যের সভ্যতা থেকে ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প উন্নত থেকে উন্নততর উচ্চাঙ্গের নিদর্শন বঙ্গোপসাগরের দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশির সম্মুখে প্রাচীন 'মিত্রবন'-এ চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে তপ্ত বালুকা রাশির উপর দাঁড়িয়ে থাকা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিলাময় ভাষায় লেখা এক অবিনশ্বর বৈজ্ঞানিক মহাকাব্য— 'কোনার্ক সূর্যমন্দির'।

বঙ্গোপসাগরের লোনা বাতাসের পরশে এখানে সময় যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এটি কেবল পাথরের স্তূপ নয়, এটি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের কল্পনার চরমতম উৎকর্ষ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এক জীবন্ত দলিল। বারো হাজার (১২০০০) শিল্পীর নিপুণ ছেনির জাদুতে জন্ম নিয়েছিল এক অনন্য মন্দির। এটি শুধুই স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন নয়, এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক জীবন্ত মানমন্দির। এখানে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতিক সূত্রের সাহায্যে, সূর্যের কৌণিক অবস্থানগুলির নিখুঁত সমন্বয়ে, কলিঙ্গ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে বিশ্ববাসীর কাছে এক বিস্ময়কর মন্দির! সূর্যের কৌণিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ঘণ্টা-মিনিটের কাঁটার মতো নির্ভুল সময় জানানোর এক আদি ও অকৃত্রিম প্রযুক্তি। সাতটি ঘোড়া সাতটি বর্ণালির প্রতীক হয়ে অর্চিষ্মানের রথটিকে টেনে নিয়ে চলছে এক অসীম যাত্রায়। যেখানে কলিঙ্গ স্থাপত্যশৈলী তার শিখর স্পর্শ করেছে। সেখানে পাথর আর মানুষের মেলবন্ধনে বিজ্ঞান তার জ্যামিতিক নকশা আর চুম্বকীয় ভারসাম্যে পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে ধরা দিয়েছে। এই মন্দিরের দেওয়াল কথা বলে। কথা বলে তার অপূর্ব শিল্পরীতির মাধ্যমে। ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী মর্যাদাপ্রাপ্ত ভারতের সাতটি বিস্ময়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় স্থাপত্যের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের আশ্চর্যজনক বিস্ময়কর নিদর্শন— 'কোনার্ক সূর্যমন্দির'। শিল্পমাধুর্য, ধর্ম আর বিজ্ঞানের গাণিতিক মহামিলনের এক অতুলনীয় সংমিশ্রণে 'কোনার্ক সূর্যমন্দির' আজ কেবল ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের এক শাশ্বত উত্তরাধিকার।

পূর্ব গঙ্গা রাজবংশের মহাপরাক্রমশালী রাজা প্রথম নরসিংহদেব বঙ্গের মুসলমান

শাসককে পরাজিত করে, তাঁর সেই ঐতিহাসিক বিজয়কে চিরস্মরণীয় করে রাখতে এবং সূর্যদেবতার অপার মহিমা বিশ্বজুড়ে প্রচার করার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব প্রতিষ্ঠিত সূর্যক্ষেত্রে এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল স্থাপত্য নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভক্তি আর বীরত্বের যুগলবন্দির আকাঙ্ক্ষায় যে শিল্পসুষমার জন্ম হয়েছিল, তারই মূর্ত প্রতীক অনন্য মহিমায় ভাস্বর--- 'কোনার্ক সূর্যমন্দির'। কিংবদন্তী স্থপতিকার বিশু মহারাণার নিপুণ নকশাকে বাস্তবে রূপদান করতে প্রধান কারিগর শিবেই সামন্ত মহাপাত্রের নির্মাণ কুশলতা ও শৈল্পিক দক্ষতার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। প্রায় ছাব্বিশ (২৬) একর ভূমির ওপর নির্মিত ২০০ ফুট উচ্চতার মন্দিরটি ১২০০ দক্ষ শ্রমিক ১২ বছর কঠোর দৈহিক পরিশ্রমে পাথর খোদাই করে অসাধারণ শিল্প কারুকার্য সমন্বিত মন্দিরটি নির্মাণ করেন। তৎকালীন সময়ে ৪০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে নির্মাণ করা হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন— 'কোনার্ক সূর্যমন্দির'।

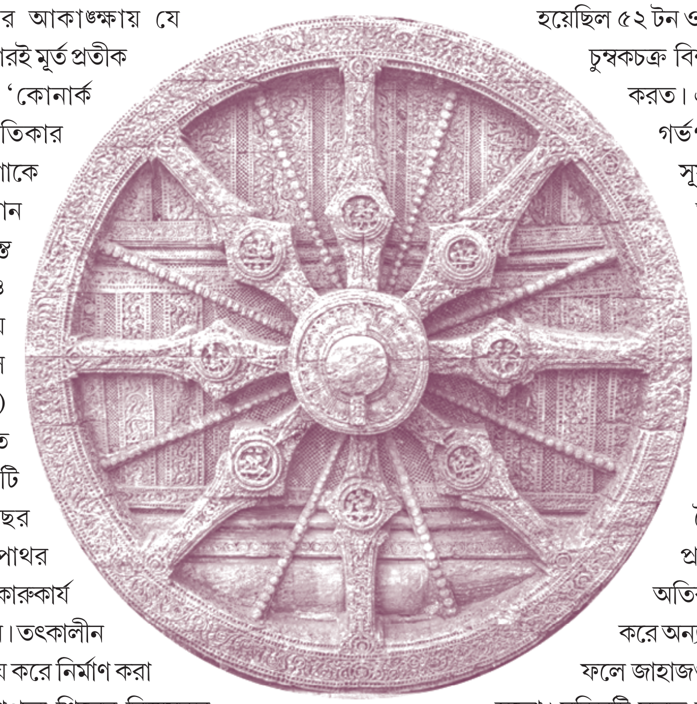

মন্দিরের স্থাপত্য সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে স্থপতিকারেরা অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এর অভ্যন্তরীণ অংশ ও মূল ভিত্তি শক্তিশালী ল্যাটেরাইট পাথর দ্বারা নির্মিত এবং সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ওপরের কাঠামোয় ব্যবহার করা হয়েছে বেলেপাথর। বিস্ময়কর বিষয় হলো এর ভিত্তির সুদৃঢ় বন্ধন। ৩৫ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১০ ইঞ্চি পুরু বিশাল বিশাল লোহার কড়ির কাঠামো ব্যবহার করে মন্দিরটিকে মজবুত করা হয়েছিল, যা স্লেকেড-লাইম দ্বারা সুরক্ষিত। যান্ত্রিক প্রযুক্তির উৎকর্ষের বহু শতাব্দী আগে ভারতীয় লৌহ শিল্পীরা অদ্ভুত নিপুণতায় এই কড়িগুলি নির্মাণ করেছিলেন, যা তৎকালীন সময়ে ইউরোপীয় প্রযুক্তিবিদদের কল্পনার অতীত।

মন্দিরের পরতে পরতে রয়েছে শিল্পনৈপুণ্য, উন্নত বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র, সময়ের প্রতীক ও মানবজীবনের দর্শন। বিশাল রথের আকারে নির্মিত দেওয়ালের দুই পাশের বারো জোড়া বৃহৎ চাকা— বারো মাস ও চব্বিশ পক্ষের প্রতীক। চাকার আটটি দণ্ড নির্দেশ করে অষ্ট প্রহরকে। এই চাকাগুলি কেবল শোভাবর্ধনই করে না, প্রতিটি চাকা এক একটি নিখুঁত 'সূর্যঘড়ি'। চাকার মাঝের দণ্ডটির ছায়া যখনই কোনো দণ্ডের ওপর পরে, তা দেখে নিখুঁতভাবে বর্তমান সময় নির্ধারণ করা যায়। এখনও মিনিট, ঘণ্টার সময় সঠিকভাবে নির্দেশ করে। রথটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামনে রয়েছে সাতটি তেজি ঘোড়া। সাতটি ঘোড়া সপ্তাহের সাতটি দিনের প্রতীক। আধ্যাত্মিক মতে এরা সূর্যের সাতটি বর্ণালির প্রতীক। এদের অগ্রগামী ভঙ্গি আমাদের শিক্ষা দেয় রথচক্ররূপী মহাকাল কখনও থেমে থাকে না, সময়ের রথ বা কালচক্র সর্বদা সম্মুখ পানে ধাবমান। মন্দিরের চূড়ার শীর্ষে স্থাপন করা হয়েছিল ৫২ টন ওজনের বিশাল চুম্বকচক্র। এই চুম্বকচক্র বিশাল মন্দিরের ভারসাম্য রক্ষা করত। এই চুম্বকীয় শক্তির আকর্ষণে গর্ভগৃহের অষ্টধাতু নির্মিত মূল সূর্যবিগ্রহ নির্দিষ্ট উচ্চতায় শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকত। প্রাচীন স্থপতিবিদরা জানতেন কীভাবে লোহার পাত ও চুম্বকের সামঞ্জস্যে বিশাল সৌধের ভারসাম্য ও দৃঢ়তা প্রদান করা সম্ভব। চুম্বকচক্রের আকর্ষণ অতিক্রম করে কোনো বৈদেশিক জাহাজ পুরীর সমুদ্রে প্রবেশ করতে পারত না। অতিকায় জাহাজগুলোকে দিক্‌ভ্রান্ত করে অন্য পথে চালিত করত এই চুম্বক। ফলে জাহাজগুলি বিপাকে পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো। মন্দিরটি মূলত নাটমন্দির, জগমোহন ও মূল গর্ভগৃহ— প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল। নাটমন্দিরে দেবতাকে উৎসর্গ করে ধ্রুপদী নৃত্য ও শিল্পের মূর্ছনা চলত। 'জগমোহন' জ্যামিতিক উচ্চতা পিরামিড- সদৃশ স্থাপত্যশৈলীর এক চরম উৎকর্ষ। গর্ভগৃহে অবস্থান করতেন মূল সূর্যদেবতা। সময়ের পরিক্রমায় গর্ভগৃহের শূন্যে ভাসমান সূর্যদেবতা আজ বিলুপ্ত, কিন্তু তার ধ্বংসাবশেষ আজও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য বহন করে। কবির ভাষায়—

'পাথরের গায়ে লেখা মহাকালের গান,
বারো জোড়া চাকা দেয় সময়ের সন্ধান।
সাতটি ঘোড়া টানে আলোর রথ খানি,
চুম্বকের টানে যেন ভাসে দিব্যবাণী।।'

মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দুই প্রান্তে অবস্থিত গজ-সিংহের চাপে পিষ্ট মানুষের মূর্তি লোভ ও অহংকারের প্রতিনিধিত্ব করে। মন্দিরের প্রবেশদ্বার পূর্বমুখী, সেখানে তিনটি দরজা অবস্থিত। জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতিক ও সূর্যের কৌণিক গতিপথ এমন নিখুঁতভাবে সমন্বিত করা হয়েছিল যে, সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পরিবর্তনে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতুতে সূর্যের প্রথম রশ্মি নাটমন্দির, প্রার্থনা মন্দিরের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট দরজার মাধ্যমে সূর্যদেবতার মুখ আলোকিত করত। সূর্যোদয়ের সময় ভিতর থেকে দেখলে মনে হতো রথের আকৃতি মন্দিরটি উজ্জ্বলতম রক্তিম সূর্যকে নীল সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে তুলে আনছে। এই দৃশ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে যেমন বিস্ময়কর, তেমনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সূর্যের কৌণিক অবস্থানের নিখুঁত জ্যামিতিক

ফঃ ৫

সমন্বয় বর্তমান বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক চরম আশ্চর্যের বিষয় ।

মন্দিরের বেদী থেকে চূড়া— সর্বত্র খোদিত পাথরের ভাস্কর্য ও কারুকার্যে পূর্ণ। পশু-পাখি, জলজ উদ্ভিদ, বিভিন্ন প্রাণী, বাদ্যযন্ত্র-সহ বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্যরত নারীদের জীবনযাত্রা সূক্ষচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনি, দেবদেবী, অপ্সরা, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ, মানুষ, বিবাহের শোভাযাত্রা, ফাঁদ পেতে হাতি ধরা, শিকারের দৃশ্য, কামশাস্ত্রের বিভিন্ন ভঙ্গির মিথুন মূর্তি-সহ সমাজের সমস্ত দিক তুলে ধরা হয়েছে। মূর্তিগুলির মানবিক আবেদন, নিখুঁত গড়ন, লীলায়িত ভঙ্গি ও পালিশকার্য ভাস্কর্যশিল্পের চরমতম উৎকর্ষের নিদর্শন। সে যুগে কঠিন প্রস্তর ছেদন ও পালিশ কার্য এমন পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের নানান আবিষ্কার সত্ত্বেও এ যুগে তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়নি। মূর্তিগুলি নীচ থেকে উপর পর্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সজ্জিত।

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও পশুপাখির চিত্র, তার উপরে বিভিন্ন লীলায়িত ভঙ্গিমায় মিথুন মূর্তি, তার উপরে নানান দেবদেবীর মূর্তি এবং বেসমেন্টে ১৪৫২টি হাতির বৃত্ত অলঙ্কৃত। বাইরের গাত্রে তিনটি সবুজ গ্রানাইট পাথরের সূর্যের মূর্তি ছিল। মূর্তি তিনটি, দিনের তিনটি সময়ের প্রতীক। প্রভাতকালীন মূর্তি সূর্যের বাল্যাবস্থা, যা বলার্কের মতো মনোরম রঙের, মধ্যাহ্নের প্রখর তেজোদ্দীপ্ত সূর্যের যৌবন অবস্থা এবং বৈকালের নিস্তেজ মূর্তি সূর্যের বার্ধক্য অবস্থা। বুদ্ধিমান, গুণীজন ও গবেষকদের জন্য এই মন্দিরের গঠনমূলক বৈজ্ঞানিক রহস্য আবিষ্কার করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

মন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে সূর্যদেবতাকে উৎসর্গ করে পূজাপাঠ আরম্ভ করা হয়েছিল।

ভারতের রহস্যময় ও অতুলনীয় স্থাপত্যশৈলীর অনন্য নিদর্শন ‘কোনার্ক সূর্যমন্দির’। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গের সুলতান সোলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়ের ধ্বংসাত্মক আক্রমণে অমূল্য সম্পদটির নান্দনিক কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্য ব্যাপকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিক মুসলমান আক্রমণে মন্দিরের স্বকীয়তা হারিয়ে সূর্যদেবতার পূজা-পার্বণ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। পবিত্রতা রক্ষায় সূর্যবিগ্রহ, নবগ্রহ অলঙ্কৃত বিশাল প্রস্তরখণ্ড এবং সম্মুখ ভাগের সুউচ্চ অরুণ স্তম্ভটি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে পর্তুগিজ জলদস্যুদের ব্যাপক লুণ্ঠন ও নির্মম অত্যাচারে কোনার্ক বন্দর জনশূন্য জনপদে পরিণত হয়। পরিচর্যার অভাবে কালক্রমে বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্যটি নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা পড়ে। সমুদ্রতট থেকে বাতাসে উড়ে আসা বালুকারাশির স্তূপে চাপা পড়ে হারিয়ে যায় কোনার্ক সূর্যমন্দিরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

দীর্ঘ প্রায় তিন শতাব্দী লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার পর, বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদদের নিরলস প্রচেষ্টায় কোনার্কের বালি অপসারণ করা হয়। বালি অপসারণ করে ১০০ ফুট উচ্চতার ক্ষতিগ্রস্ত মূল মন্দির, সূর্যদেবতার দুই পত্নী ছায়াদেবী ও মায়াদেবীর মন্দির, ভোগমন্দির, শ্রমিকদের ব্যবহৃত প্রাচীন কুয়ো-সহ একটি প্রার্থনাকক্ষের ধ্বংসাবশেষ পুনরায় উন্মোচিত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে মন্দিরের অষ্টধাতুর মূল বিগ্রহ, বিশাল আকর্ষণীয় চুম্বক চক্র এবং অসংখ্য কারুকার্যমণ্ডিত অমূল্য পাথর লন্ডনের সংগ্রশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। এইসব ঐতিহাসিক সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার ফলে মন্দিরটি আজ পূর্ণাঙ্গ রূপ ও জৌলুস হারিয়ে অপূর্ণ রূপ ধারণ করে রয়েছে।

১৯০৩ সালে বড়লাট কার্জন অধ্যাদেশ জারি করে কোনার্ক সূর্যমন্দিরের গর্ভগৃহ বালি দ্বারা পূর্ণ করে এর প্রবেশদ্বার চিরতরে বন্ধ করে দেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে খোদাই করা সেই ঐতিহাসিক নির্দেশ আজও পরাধীনতার সাক্ষ্য বহন করে ।

TO PRESERVE THIS SUPERB SPECIMEN
OF
OLD INDIAN ARCHITECTURE
THE INTERIOR WAS FILLED IN –
BY ORDER OF
THE HON’BLE. J. A .BOURAILON C.S.I
LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL
Ad 1903

এই অধ্যাদেশ বলে ১২৩ বছর ধরে এই বিশ্ববিশ্রুত মন্দিরের অন্তরাত্মা সর্বসাধারণের জন্য রুদ্ধ হয়ে আছে। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পর্যটক মন্দিরের বিস্ময়কর ভাস্কর্য দেখে বিমোহিত হন, কিন্তু সকলের মনে এক অতৃপ্ত কৌতূহল জাগ্রত হয়— কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওই বদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভেতরে? স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও কার্জনের দাসত্বের চিহ্ন বাতিল করে কেন সূর্যমন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা খোলা হচ্ছে না? কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বর্তমান ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ (আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ১২২ বছর পর পুরানো বালি অপসারণের এক ঐতিহাসিক প্রকল্প শুরু করেছে।

স্বাধীনতার সাত দশক পর ঔপনিবেশিক কলঙ্কের অবসান ঘটিয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরীণ রহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারত-সহ বিশ্ববাসীর মনে এক নব প্রেরণার সঞ্চার করেছে।

কোনার্ক কেবল ধূসর পাথরের স্থাপত্য নয়, এটি অজস্র মানুষের স্বপ্নের এক গাণিতিক ধীশক্তির স্পন্দিত মহাকাব্য। এখানে বিজ্ঞান, শিল্প ও আধ্যাত্মিকতা একই রেখায় মিলিত হয়েছে। যেখানে সূর্যের প্রথম রশ্মি কেবল বিগ্রহকে স্পর্শ করে না, এখানে ভারতীয়র মেধার আলোকবর্তিকাকে বিশ্ব দরবারে উদ্ভাসিত করে। বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের গর্জনে আজও যেন ধ্বনিত হয় মানুষের সৃজনশীলতা, শিল্পীদের নিপুণ শিল্পসত্তা ও মেধার জয়গান। মহাকালের এই বালুকাবেলায় কোনার্ক এক অমর সারথি, যা আগামী প্রজন্মের কাছে প্রমাণ করে শিল্প যখন বিজ্ঞানের হাত ধরে, তখন সৃষ্টি লাভ করে এক শাশ্বত অমরত্ব।

কোনার্ক আজও বিশ্বের কাছে বিস্ময়কর, তাই প্রকৃত অর্থে পাথরের পৃষ্ঠায় খোদিত বৈজ্ঞানিক মহাকাব্য। ▯

নীরব জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের পথে কোচবিহার

সুমন কল্যাণ ভদ্র

সংখ্যা কখনো উচ্চকণ্ঠ নয়। তারা শোরগোল তোলে না, মিছিল করে না, বক্তৃতাও দেয় না। কিন্তু সময়ের স্রোতে জমে ওঠা কিছু সংখ্যা একসময় সমাজ, রাজনীতি ও প্রশাসনের সামনে এমন কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে, যেগুলিকে আর সহজে উপেক্ষা করা যায় না। উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা কোচবিহার আজ তেমনই এক নীরব পরিবর্তনের সাক্ষী।

গত তিন দশকে জেলার জনসংখ্যার গঠনে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা এখন ক্রমশ আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। সরকারি জনগণনা এবং সাম্প্রতিক জনসংখ্যাগত অনুপাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোচবিহারে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই পরিবর্তন কেবল পরিসংখ্যানের বিষয় নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সীমান্ত, সমাজ, প্রশাসন এবং নির্বাচনী রাজনীতির বহুস্তরীয় বাস্তবতা।

১৯৯১ সালে কোচবিহারের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২১.৭ লক্ষ। তার মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৬ হাজার ৭২৮ জন, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩.৩৪ শতাংশ। একই সময়ে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৬.২ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৪ থেকে ৭৫ শতাংশ।

২০১১ সালের জনগণনায় জেলার মোট জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৬ জনে। মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫.৫৪ শতাংশ, আর হিন্দুদের অনুপাত নেমে আসে প্রায় ৭২.০৬ শতাংশে।

সাম্প্রতিক প্রবণতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনায় ২০২৬ সালের অনুমান অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৩ থেকে ৩৫ লক্ষের মধ্যে পৌঁছতে পারে। এর মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ১০ লক্ষ অতিক্রম করে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৯ থেকে ৩০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে হিন্দু জনসংখ্যা প্রায় ২২.৩ লক্ষ হলেও তাদের অংশীদারিত্ব কমে প্রায় ৭০ শতাংশের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে।

তিন দশকের তুলনামূলক চিত্র হলো, ১৯৯১ থেকে ২০২৬— এই দীর্ঘ সময়পর্বে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ৬৭ শতাংশ বলে অনুমান করা হচ্ছে। একই সময়ে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রায় ৩৭ শতাংশ। অর্থাৎ পরিসংখ্যানের ভাষায় বলতে গেলে, গত তিন দশকে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় প্রায় ১.৭ গুণ বেশি।

বিধানসভাভিত্তিক জনসংখ্যার রূপরেখা—

● দিনহাটা : ৪০—৪২ শতাংশ। ● শীতাই : ৩৮---৪০ শতাংশ। ● শীতলকুচি : ৩৫—৩৬ শতাংশ। ● তুফানগঞ্জ : ২৮—৩০ শতাংশ। ● কোচবিহার দক্ষিণ : ২৮—২৯ শতাংশ। ● নাটাবাড়ি : ২৭—২৯ শতাংশ। ● মাথাভাঙ্গা : ২৪---২৬ শতাংশ। ● কোচবিহার উত্তর : ২০—২২ শতাংশ। ● মেখলিগঞ্জ : ১৮—২০ শতাংশ।

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে এই প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনার বিষয়।

বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন জেলা হিসেবে কোচবিহার বরাবরই সীমান্ত পারাপার এবং অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। সমালোচকদের একাংশের দাবি, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের পেছনে অবৈধ অনুপ্রবেশের ভূমিকা থাকতে পারে। যদিও এই বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান এবং সরকারি অবস্থান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটি অংশ মনে করেন, এই প্রশ্ন কখনো কখনো নির্বাচনী সমীকরণ এবং ভোটব্যাংক রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। ফলে বিষয়টির প্রশাসনিক ও জাতীয় নিরাপত্তাগত দিকগুলি অনেক সময় রাজনৈতিক হিসেব- নিকেশের আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

উদ্বেগ কি শুধুই হিন্দুদের? এই প্রশ্নকে শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পরিসরে সীমাবদ্ধ করে দেখলে বিষয়টির গভীরতা বোঝা সম্ভব নয়। অনেক বিশ্লেষকের মতে, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন এবং অনুপ্রবেশ নিয়ে অস্পষ্টতা দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় মুসলমান সমাজের জন্যও উদ্বেগের বিষয় হতে পারে। কারণ, অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে বিতর্ক অনেক সময় প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে দেয়। এর ফলে সামাজিক অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়, যা কোনো কারোর জন্যই মঙ্গলজনক নয়।

অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর এখনো অমীমাংসিত—

● এই পরিবর্তনের প্রকৃত চালিকাশক্তি কী? ● সীমান্তবর্তী অনুপ্রবেশের ভূমিকা কতখানি? ● প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি কি এই পরিবর্তনের গতিপথকে প্রভাবিত করেছে? ● ভবিষ্যতে এই প্রবণতা জেলার সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে কীভাবে প্রভাবিত করবে?

কোচবিহারের জনসংখ্যাগত বিবর্তন আজ আর নিছক পরিসংখ্যানের বিষয় নয়। এটি সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, সামাজিক ভারসাম্য এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার এক জটিল সমীকরণে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনী সমীকরণের আলোচনায় এই প্রশ্ন ক্রমশ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

কোচবিহারবাসী এবার আশাবাদী হয়ে উঠতেই পারে

অশোক কুমার ঠাকুর

আজ পর্যন্ত কোনো দিন, বিধানসভায় এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কোচবিহারের মুখ কোচবিহারবাসী দেখতে পাননি। আমি প্রথমেই স্বাগত ও অভিনন্দন জানাই এই তিনজন লড়াকু নেতৃত্বকে যারা নিজ দক্ষতায় আজকের এই আসনে আসীন হয়েছেন।

শুধু কোচবিহার নয়, গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে এই প্রথম রথীন্দ্র বোস পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করলেন। উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারবাসীর কাছে এটা যে কত বড়ো গৌরবের, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, অভিবাদন জানাই রথীন্দ্র বোসকে। উত্তরবঙ্গ একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের যেকোনো জেলা থেকে হতে পারতেন, কোচবিহারবাসীর অত্যন্ত সৌভাগ্য, কোচবিহারের ভূমিপুত্র নিশীথ প্রামাণিক এই পদটি পেয়েছেন, তাকে অভিনন্দন। সর্বশেষ পদটি পেলেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় দক্ষ সাংগঠনিক নেত্রী মালতী রাভা রায়। তিনি প্রতিমন্ত্রী হয়েও পূর্ণ মন্ত্রী, স্বাধীন দপ্তর প্রাপ্তা। অভিনন্দন জানাই সম্মাননীয়া মালতী রাভা রায়কে।

কোচবিহারবাসীর অন্তরের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের, চাওয়ার আছে অনেক, বলবার সঠিক জায়গা ছিল না এতদিন। যারা এতদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের কাছে সমষ্টি উন্নয়নের চেয়ে ব্যষ্টি উন্নয়ন প্রাধান্য পেয়েছিল অনেক বেশি। বিগত সরকারের আমলে কোচবিহারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং একটি কারিগরি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোনোটারই সঠিক পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। এখনো উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটতে হয় দক্ষিণবঙ্গে অথবা দেশের অন্যান্য রাজ্যে।

কোচবিহারে কোনো আর্ট কলেজ নেই, কোনো মিউজিক কলেজ নেই, পারফর্মিং আর্ট শেখার কোনো বন্দোবস্তই নেই। কোচবিহার শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত হলেও এখানকার চিত্র শিল্পী, ভাস্কর, সঙ্গীত শিল্পী সকলেই স্বশিক্ষিত, ব্যক্তিগত উদ্যোগে, অভিভাবকদের আনুকুল্যে। তথাকথিত 'পাশ করা' কোনো শাখারই প্রায় কেউ নেই। থাকবে কী করে? শিল্পকলা বিভাগের যেকোনো শাখায় ন্যূনতম ডিগ্রির জন্য ছুটতে হয় কলকাতায়। আর যারা এসব বিষয়ে পড়াশোনা করতে কলকাতা যান, তারা আর ফিরে আসেন না। আসার উপায় থাকে না, কর্মসংস্থানের অভাবে। কলকাতায় অন্তত কিছু একটা করে খাওয়া যায়। এবার আমরা আশাবাদী

১। কোচবিহারে একটা সরকারি আর্ট কলেজ হবে। যেখানে চিত্রশিল্পের সব মাধ্যম যেমন— তেলরং, জলরং, অ্যাক্রিলিক, প্যাস্টেল, টেম্পারা, কালি-কলম, ডিজিটাল মাধ্যম সবকিছু শেখানোর সুব্যবস্থা থাকবে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে, রিলিফ ভাস্কর্য। সংযোজন মূলক ভাস্কর্য। বিয়োজন মূলক ভাস্কর্য। ঢালাই ভাস্কর্য বিষয়ে খুঁটিনাটি নিখুঁতভাবে শেখানো হবে।

২। কোচবিহারে এবার একটা সরকারি পারফর্মিং আর্ট কলেজ হবে। এখানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি, লোকসঙ্গীত ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানো শিক্ষার যথোপযুক্ত সুযোগ থাকবে।

নৃত্যের ক্ষেত্রে, শাস্ত্রীয় নৃত্য, ভরতনাট্যম, কত্থক, কথাকলি, লোকনৃত্য, সমসাময়িক আধুনিক নৃত্য অর্থাৎ নৃত্যের সকল ঘরানা শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকবে।

থিয়েটার, নাটক, চলচ্চিত্র, মিডিয়া এইসব বিষয়েও নির্ধারিত পাঠ্যক্রম থাকবে যেমন অভিনয় কৌশল, স্ক্রিপ্ট লেখা, মঞ্চ পরিচালনা, নির্দেশনা, থিয়েটার প্রোডাকশন।

ফিল্ম মেকিং, সিনেমাটোগ্রাফি চিত্রনাট্য তৈরি করা, অডিও ভিস্যুয়াল সম্পাদনা এবং স্ট্যান্ডআপ কমেডির মতো বিষয়।

কোচবিহারবাসী আশাবাদী অনেক বিষয়ে, যেহেতু আমি শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত এবং নিজে টুকটাক চিত্রশিল্প চর্চা করি সেইজন্য এই দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবি জানালাম। 'আর্ট' বিষয়টি শুধু শখের নয়, এটি বৃত্তিমূলক, পেশাগত।

যে যেকোনো আর্টই হোক সঠিক দক্ষতা অর্জন করলে সাংস্কৃতিক জগতে সুনামের সঙ্গে যেমন বাঁচতে পারেন, তেমনি অর্থোপার্জনও করতে পারেন বিস্তর। কোচবিহারবাসী সে সুযোগ থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত হচ্ছে।

৩। 'পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমি'র 'উত্তরবঙ্গ দপ্তর' খোলা হবে, কোচবিহারে। এই ব্যাপারে আমরা আশাবাদী হতেই পারি। কোচবিহার রাজার শহর। কোচবিহারের জাতীয় গ্রন্থাগার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বহু হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি আজও সংরক্ষিত আছে। পুঁথিগুলোর উপরে-নীচে আছে কাঠের পাটা, পাটার উপর আঁকা পাটা চিত্র।

এই পুঁথিগুলোর এবং পাটা চিত্রগুলোর আজও কোনো মুদ্রিত রূপ প্রকাশিত হয়নি। এভাবে পুঁথিগুলো, ছবিগুলো পড়ে থাকলে কালের গর্ভে হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে, মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সাহিত্য আকাদেমির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

কোচবিহারে পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমির উত্তরবঙ্গ দপ্তর হলে গোটা উত্তরবঙ্গের সাহিত্য, সংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণ, প্রচার, প্রসার সহজতর হবে। কবি সুনির্মল বসু লিখেছিলেন—

'আমার মনের অবাধ বাসনা অথৈ আকাশে ছড়িয়ে যায়
আমার মনের আশার অশোক ঝর্ণার মতো গড়িয়ে যায়।'

কোচবিহারের আকাশে, বাতাসে, নদীর স্রোতে কান পাতলে, আজ শুধু শোনা যায় 'আশার কথা, আশার কথা'। আশা করি কোচবিহারবাসীর দীর্ঘদিনের 'আশা', বর্তমান নেতৃত্বের হাত ধরে পূর্ণতা পাবে। □

নানান প্রতিবন্ধকতাও থামাতে পারেনি অমিয় কুমার মল্লিককে

নিলয় সামন্ত

কলকাতার সল্টলেকে স্পোর্টস্ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অ্যাথলেটিক্স কমপ্লেক্সে বসেছিল ভারতের অ্যাথলেটিক সিরিজ এগারোর আসর। দিনের শেষে সেখানেই দেখা হয়ে গেল অমিয় কুমার মল্লিকের সঙ্গে। এইদিন তিনি ১০০ মিটার দৌড় শেষ করেন ১০.৮৩ সেকেন্ডে। অথচ তাঁর ১০০ মিটার দৌড়ে তার সেরা সময় ছিল ১০.২৬ সেকেন্ড। যেটা জাতীয় রেকর্ড। অমিয় ওড়িশার অ্যাথলিট আর কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজির ছাত্র ছিলেন। ওই একই রাজ্যের এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অনিমেষ কুজুর অমিয়র এই ১০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড ভেঙে ফেলেন ১০.১৮ সেকেন্ডে।

কয়েক বছরে তার অনেক প্রতিবন্ধকতা গিয়েছে। বয়স হয়ে গিয়েছে তেত্রিশ বছর। তারপরেও তিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আর সেই লড়াইয়ের কথা জানার জন্যই তাকে ধরেছিলাম ইভেন্ট শেষ হওয়ার পরেই।

সম্প্রতি ওয়ার্ম-আপ করার সময় হঠাৎই তিনি কোমরের নীচের অংশে তীব্র ঝাঁকুনির মতো ব্যথা অনুভব করেন। সেই মুহূর্তটা সহজ ছিল না। শারীরিকভাবে এই সমস্যাগুলো তাঁকে ভোগাচ্ছে, কিন্তু এগুলোকে হারিয়েই তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে।

চোট তার জীবনে নতুন কিছু নয়। ২০০৫ সাল থেকেই খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘ ক্রীড়া জীবনে বহুবার আঘাত পেয়েছে একবার গুরুতর চোটের কারণে প্রায় ১৫ দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনো এসব নিয়ে ভয় পাননি। এগুলো খেলাধুলারই অংশ। যদিও ভেতরে ভেতরে মানসিক চাপ তৈরি হয়, তবুও তিনি নিজেকে মানসিকভাবে শক্ত রাখার চেষ্টা করেন।

তিনি বলেন, 'যুব কমনওয়েলথ গেমসে দেশের হয়ে সোনা জয়ের স্মৃতি আজও আমার কাছে বিশেষ মুহূর্ত। ২০০ মিটারে সেই পদক

অর্জন ছিল ঐতিহাসিক। ২০২২-২৩ সালে আমি জাতীয় রেকর্ডও গড়েছিলাম। এরপর চোট, দীর্ঘ বিরতি— সবকিছু কাটিয়ে ২০২৩ সালে আবার ট্র্যাকে ফিরি। তখন আমার পাশে ছিলেন সাপোর্ট স্টাফ, পুষ্টিবিদ ও কোচিং টিম। তাঁদের সহযোগিতাতেই আবার নতুন করে শুরু করতে পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি, একজন অ্যাথলিটের শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না; প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি এবং ধারাবাহিক সহায়তা। দুর্ভাগ্যজনক- ভাবে আমাদের দেশে সেই সহায়তা অনেক সময় কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। কর্পোরেট সংস্থাগুলোর সমর্থনও অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক। তারা বর্তমান পারফরম্যান্স দেখে সিদ্ধান্ত নেয়— একজন ক্রীড়াবিদের সামগ্রিক সক্ষমতা বা দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা। প্রায়ই ক্রিকেটের সঙ্গে অ্যাথলেটিক্সের তুলনা বিভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে। একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার শতরান করার পর যদি চোট পান, সুস্থ হয়ে ফিরে এলে তাঁর জায়গা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অ্যাথলেটিক্সে একজন ক্রীড়াবিদকে চোট কাটিয়ে ফিরে এসেও আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হয়। নতুন করে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, নতুন করে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। এই বাস্তবতা খুব কঠিন।

ভারতে অ্যাথলিটদের সামনে আরও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ১০০ মিটার দৌড়ানোই কঠিন হয়ে পড়ে। দীর্ঘ দূরত্বের ইভেন্টে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়। তার ওপর দেশের অধিকাংশ ট্র্যাক আন্তর্জাতিক মানের নয়। পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও দৌড়বিদদের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলে।

আমার লক্ষ্য খুব পরিষ্কার। আমি ধাপে ধাপে নিজের সেরাটা ফিরে পেতে চাই। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমি আগেও দেশের হয়ে পদক জিতেছি। ২০১৯ সালে রিলে ইভেন্টে রুপোর পদকও অর্জন করেছি। তাই আন্তর্জাতিক মঞ্চ আমার কাছে নতুন নয়। এবারও দেশের জন্য সেরাটা দিতে চাই এবং দলের সাফল্যে অবদান রাখতে চাই।

আরেকটি বিষয় আমাকে ভাবায়। বিভিন্ন রাজ্যে যে হাই পারফরম্যান্স সেন্টার তৈরি হচ্ছে, সেখানে বাইরের রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, একটি রাজ্যের হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই রাজ্যের নিজস্ব প্রতিভাবান অ্যাথলিটদের গড়ে তোলা। এটি জাতীয় ক্যাম্প নয়। যদি বাইরের ক্রীড়াবিদদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তাহলে স্থানীয় প্রতিভারা পিছিয়ে পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গের স্প্রিন্টের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বহু আন্তর্জাতিক মানের স্প্রিন্টার এখান থেকে উঠে এসেছেন। প্রতিভার কোনো অভাব নেই। একজন সিনিয়র অ্যাথলিট হিসেবে আমি চাই, আমরা নিজেদের ঘরের প্রতিভাকে আরও বেশি গুরুত্ব দিই। তাহলেই ভবিষ্যতে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স আরও শক্তিশালী হবে।

আমি জানি, পথ সহজ নয়। শরীরের সমস্যা, চোট, পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা— সবকিছুই রয়েছে। তবুও আমি বিশ্বাস করি, লড়াই চালিয়ে গেলে সাফল্য একদিন অবশ্যই ফিরে আসবে।' □

তোষামোদে ভুললে ঠকতে হয়

একটি কাক কোথাও থেকে এক টুকরো মাংস জোগাড় করেছিল। সে একটি গাছের ডালে বসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ওই মাংসের টুকরো খাবে বলে ঠিক করল। সে মাংসটি খাওয়ার তোড়জোড় করছে তখনই একটি শেয়াল ওই গাছের নীচে এল।

এসেই উপরের দিকে তাকিয়ে শেয়ালের চোখে পড়ল গাছের ডালে বসে একটা কাক মাংস খাবার তোড়জোড় করছে। দেখেই তার মনে হলো, যে ভাবেই হোক কাকের মুখ থেকে ওই মাংস তাকে ছিনিয়ে নিতেই হবে।

কী করা যায়, কী করা যায় ভাবতে ভাবতে শেয়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। সে কাককে ডেকে বলল-- ভাই, আমি তোমার মতো এত সুন্দর পাখি অন্য কোথাও দেখিনি। আহা ! কী সুন্দর তোমার গায়ের রং, কী সুন্দর ডানা, কী অপূর্ব চোখ তোমার, কী মিষ্টি তোমার স্বভাব। কী অপূর্ব তোমার শরীর, তেমনি তোমার নখ। শুধু দুঃখের কথা এই, তুমি বোবা। তোমার গলা দিয়ে স্বর বের হয় না।

কাক শেয়ালের মুখে এমন প্রশংসা শুনে খুব আনন্দ পেল। অন্য কেউ আগে এভাবে তার প্রশংসা করেনি।

সে ভাবল, বোকা শেয়ালটা ভেবেছে সে বোবা। এসময়ে আমি যদি শব্দ করি তাহলে তো শেয়ালটা একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবে। সে আমার ডাক তো আগে শোনেনি।

এই ভেবে খুশি হয়ে কাক বেশ জোরেই কা-কা বলে ডেকে উঠল। যেই না ঠোঁট ফাঁক করেছে অমনি তার ঠোঁটে ধরা মাংসখণ্ডটি মাটিতে পড়ে গেল।

শেয়াল তো এটাই চেয়েছিল। কাকের মুখ থেকে মাংসের টুকরোটি পড়ে যেতেই সে মনের আনন্দ আর চেপে রাখতে পারল না। সে লাফাতে লাফাতে মাংসের টুকরোটি মুখে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। বেচারি কাক বোকার মতো বসে রইল।

নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেউ তোষামোদ করলে তাতে বিগলিত হলে ঠকতে হয়।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

ওয়ান্দুর

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত সামুদ্রিক সংরক্ষিত উদ্যান সরকারিভাবে মহাত্মা গান্ধী মেরিন ন্যাশনাল পার্ক নামে পরিচিত। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে এই উদ্যানে ১৭টি ছোটো বড়ো দ্বীপ এবং বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক এলাকা রয়েছে। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, প্রবাল প্রাচীর ও সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য ১৯৮৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলি হলো রেডস্কিন আইল্যান্ড ও জলি আইল্যান্ড। এখানে তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা দৈত্যাকার ক্ল্যাম, বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ, নোনাজলের কুমির এবং নানা রকমের পাখি দেখা যায়। এখানে জল এত স্বচ্ছ যে কাচের তলাযুক্ত নৌকায় বসে অনেক নীচের প্রবাল ও রঙিন মাছ দেখা যায়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১৭

भूतकाल: – स्त्रीलिङ्गे (भाग–२)

অতীতকাল – স্ত্রিলিঙ্গে

वालिका विद्यालयं गतवती।

বালিকাটি বিদ্যালয়ে গিয়েছিল।

का विद्यालयं गतवती ?

কে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল?

गायिका गीतं गीतवती।

छात्रा उत्तरं लिखि? तवती।

शिक्षिका लेखानीं दत्तवती।

माता पाकं कृतवती।

सा उद्याने क्रीडितवती।

भवति रोटिकां खादितिवती।

ভালো কথা

মাছের ঘর

আষাঢ় মাস এসে গেছে। এখনো সেভাবে বৃষ্টির দেখা নেই। আমাদের গ্রামের বড়ো পুকুরটার জল খুবই কমে গেছে। দুপুরে রোদের তাপে জল গরম হয়ে উঠলেই বড়ো বড়ো মাছগুলো একেবারে ধারে এসে খাবি খেতে থাকে। দাদু মাছগুলিকে খুবই ভালোবাসে। ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। সেদিন দুপুরে দাদু পুকুরের মাঝখানে অনেকখানি জায়গার পাঁক তুলে ফেলে গর্ত করে দিয়ে বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার উপর গাছের ডালপালা দিয়ে ছাউনি করে দিয়েছে। দুপুরে রোদের তাপ বাড়লে মাছগুলি ওই ছাউনির নীচে গর্তে চলে আসে। দাদু দুপুরে সেখানে গিয়ে আটার ছোটো ছোটো গুলি মাছগুলিকে খেতে দেয়। আমি সেদিন দাদুর সঙ্গে গিয়ে ওদের খাওয়া দেখেছি। আমাকে দেখে ওরা ভয় করছিল। কিন্তু দাদুকে ভয় করছিল না।

কেয়া ঠাকুর, নবমশ্রেণী, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মা

সুস্মিতা চক্রবর্তী, দ্বাদশ শ্রেণী, কাছারি রোড, শিলচর।

শরীরটি খারাপ হলে
রাত জেগে বসে থাকা
সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি কে?
মন খারাপ হলে
মন ভালো করে দেওয়া
সবচেয়ে কাছের মানুষটি কে?

কীসে ভালো হয়
কীসে ভালো থাকবে
সারাক্ষণ ভাবনা করে কে?
নিজের কোনো ভাবনা নেই
নিজের কোনো চাওয়াপাওয়া নেই,
সকলের প্রিয় মা যে সে!

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতাজী 'ভ্যানিশ'-এর নেপথ্য রহস্য

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পরিবর্তনের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে রাজ্যসরকারের 'হাতে থাকা' মাত্র ৬৪টি গোপনীয় নেতাজী ফাইল প্রকাশ করেন। সেদিন প্রবল উৎসাহ ছিল নেতাজী অনুরাগী মহলে। নেতাজী ফাইল প্রকাশের দাবিতে বহু সংগঠন পদযাত্রা, অনশন, অবস্থান ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরে করছিলেন। জনগণের ইচ্ছাকে মান্যতা দিতে মমতা ব্যানার্জি হঠাৎই নেতাজী ফাইল প্রকাশের কথা জানান। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফাইলগুলি সিডিতে করে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেবার জন্য তিনশো টাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করেন। ফাইলগুলি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশের আগেই দেখা গেল তৎকালীন শাসক ঘনিষ্ঠ টিভি চ্যানেলে সকাল থেকে বারবার প্রচারিত হতে লাগলো যে নেতাজী ফাইলে 'নেতাজীপত্নীর চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। এমিলি শেঙ্কেলের স্বাক্ষর বিহীন টাইপ কপি। এলগিন রোডে বসুপরিবারের চিঠিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা যে নজরদারি চালাতো সে বিষয়ে নানা চিঠিপত্র ইত্যাদি। তবে মিডিয়া ফোকাস ছিল নেতাজীর তথাকথিত স্ত্রী এমিলি শেঙ্কেল ও কন্যা অ্যানিটা বিষয়ে। অনেক ফাইলেরই পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তথাকথিত বিবাহের গল্প লেখা 'জোরালো' রিপোর্টের একই কপি দুটি এবং দুটি কপিরই বিশেষ জায়গায় লেখা ছেঁড়া। অনুমান করা যায়, পুরোনো ফাঁকা লেটার হেডে টাইপ করে কিছু লেখা হয়েছে। পুরোনো ফাঁকা লেটার হেড দুষ্প্রাপ্য নয় বিশেষ করে বর্তমানে যারা নেতাজীভবনের সর্বময় কর্তা সেই দাবিদার পরিবার করে।

এক সময় রাজা রামমোহন রায়ের কাছাড়ি বাড়ি ছিল বর্তমানের পুলিশ মিউজিয়াম। দোতলা ঘরটির বাঁদিকে ঘরগুলিতে ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বোমা, পিস্তল ইত্যাদির প্রদর্শনীকক্ষ যেগুলির অধিকাংশ স্থানান্তরিত

হয়েছে আলিপুর মিউজিয়ামে। ডানদিকের কক্ষগুলিতে রাজ্যপুলিশের নানা কেসের সাফল্য ও আধুনিক তদন্ত সম্পর্কিত নানা জিনিসপত্র শোভা পাচ্ছে। দোতলার ডানদিকের ঘরে ঢুকে বাঁদিকে একটি ঘরে কমপক্ষে প্রায় দশটি সুউচ্চ লোহার র‍্যাকে লাইব্রেরির মতো অসংখ্য পুরোনো আমলের ফাইল থরে থরে সাজানো। দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশকর্তা সেদিন জানিয়েছিলেন ফাইলগুলি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কিত। দায়িত্ববান পুলিশকর্তাকে প্রতিবেদক ও সঙ্গী সাংবাদিকদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও প্রায় হাতের নাগালে থাকা ফাইলগুলিকে কপি করার অনুমতি দেননি। বলেছিলেন পুলিশের সর্বোচ্চ পর্যায় আবেদন জানাতে। কিছুদিন পরেই তৎকালীন রাজ্য সরকারের পক্ষে ঘোষণা হলো যাবতীয় গোপন নেতাজী ফাইল প্রকাশ করা হবে। দেশের মধ্যে প্রথম এমন সিদ্ধান্তে নেতাজী অনুরাগী গবেষক এবং সাধারণ মানুষ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। প্রচারমাধ্যমে বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। নেতাজী ফাইলগুলিকে 'ডিজিটাইস' করা হবে বলে প্রস্তুতি চলে। সমাজ মাধ্যমেও ছড়িয়ে যায় নেতাজী ফাইল ডিজিটাইস করার ছবি। আশ্চর্যের বিষয় যে, দেখা যায় ঘরের মেঝের মধ্যে ডাঁই করে রাখা কিছু পুরোনো ফাইলের চিত্র। কিছুদিনের মধ্যে জানানো হলো ৬৪টি ফাইল প্রকাশ করা হবে এবং ডিজিটাইস করার কাজ শেষ হয়েছে।

এমনকী সাধারণ মানুষ ইচ্ছা করলে যেমন সিডিতে থাকা ফাইলগুলি ক্রয় করতে পারবেন, তেমনি পুলিশ মিউজিয়ামের দোতলার একটি কম্পিউটার ঘরে অনেকগুলি কম্পিউটার রাখা থাকছে আগ্রহী গবেষক কিংবা দর্শনার্থীরা ইচ্ছা করলে ফাইলের ছবিগুলি দেখতে পারেন। আপাত ভাবে অবশ্যই সাধু প্রয়াস বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু নেপথ্যে রয়ে গেছে দাবিদার পরিবারের একাংশের নেতাজীকে নিয়ে মিথ্যাচারের খেলা। উল্লেখ্য, শাসকদলের দুই সাংসদ মা ও পুত্র তখন নেতাজী ফাইল প্রকাশের আসলে যথারীতি নেতাজীর পরিবারের দাবিদার প্রধান মুখ।

দিনটা ছিল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫। সকাল থেকেই জি-২৪ ঘণ্টা সংবাদ চ্যানেলে ফাইলে নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যা'র চিঠিপত্র আছে বলে খবর চলতে লাগল একটানা। বেলার দিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নেতাজী ফাইলের সিডি প্রথম তুলেছিলেন নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রয়াত ডাঃ শিশির বসুর স্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সাংসদ কৃষ্ণা বসুর হাতে। পুলিশ মিউজিয়ামের প্রাঙ্গণে তখন নেতাজী অনুরাগীদের উপচে পড়া ভিড় আর জাতীয়, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে টিভি চ্যানেলের হুড়োহুড়ি ছিল চোখে পড়ার মতো। মাত্র ৬৪টি ফাইল প্রকাশ্যে এল। এবং ওই ফাইলগুলি কাঁচের শোকেসে সাজিয়ে রাখা হলো। কিন্তু বাইরে থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাবে কয়েকটি পুরোনো ফাইলের নীচে পরিষ্কার এ-ফোর সাইজের সাদা কাগজ ভিতরে রেখে

ফঃ ৬

দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটার ঘরের প্রথম কম্পিউটারের সার্চ করলে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এমিলি শেঙ্কেল ও অ্যানিটা পাফের ছবি-সহ একটি প্রতিবেদন। এটি আদৌ গোপনীয় নেতাজি ফাইলের গোপন রিপোর্ট হিসেবে দাবি করা যায় না। নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু, চিতাভস্ম, নেতাজীর তথাকথিত বিবাহ, স্ত্রী-কন্যার গল্পের একনিষ্ঠ প্রচারক শিশির বসুর ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের কাছে নেতাজী সম্পর্কিত গোপনীয় ফাইলগুলি আগেভাগেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ছাড়পত্র প্রদানের জন্য তাদের হাতে চলে গিয়েছিল স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

মমতা ব্যানার্জির নেতাজীর প্রতি স্বাভাবিক আবেগকে সামনে রেখে সুযোগসন্ধানীরা নেপথ্যে এক ন্যাক্কারজনক খেলা খেলেছিল। নেতাজীর জন্মশতবর্ষে ২৩ জানুয়ারি মমতা ব্যানার্জির দাবি মান্যতা পেয়েছিল। অবশ্য ঘটনাক্রমে নেতাজীর জন্মশতবর্ষ চলাকালে তিনজন প্রধানমন্ত্রী হতে দেখেছিল দেশ। ওই বছরই ঘটনাক্রমে ছিল ভারতের 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'। সেই সময় দিল্লির কংগ্রেস সরকার নেতাজীর জন্মশতবার্ষিকী কমিটিকে কার্যত নেতাজীর 'চিতাভস্ম' ভারতে আনার কমিটি করে তুলেছিল। লেখক সরাসরি যে সময় মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করে 'চিতাভস্ম' ভারতে আনা আটকাতে অনুরোধ করেন তিনি বলে ছিলেন মনে থাকবে। সেদিনের কথা মনে রেখেছিলেন। দু'দিন পর পার্লামেন্টে তিনি ও ফরোয়ার্ডব্লকের সাংসদ চিত্ত বসু তথাকথিত নেতাজীর 'চিতাভস্ম' ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। নেতাজী তদন্তে মুখার্জি কমিশন সদ্য কাজকর্ম শুরু করেছে। লেখকের প্রথম বই 'নেতাজী গেলেন কোথায়?'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁর বাড়িতে দিয়ে এসেছিলেন। ফোন এসেছিল তাঁর বাড়ি থেকে। বাড়িতে না থাকায় তিনি রেলমন্ত্রীর লেটারহেডে বইটির সাফল্য কামনা করে চিঠি দিয়েছিলেন লেখককে।

তাঁর পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন অনেক লড়াই সংগ্রামের পর। ততদিনে তাঁর দলের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন নেতাজী রিসার্চব্যুরোর ডিরেক্টর প্রয়াত শিশির বসুর স্ত্রী কৃষ্ণা বসু। তাঁর পুত্র সুগত বসুও তাঁর মায়ের মতো লোকসভার সাংসদ হয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জির বদান্যতায়। ভোটের সময় অবশ্য শরৎ বসুর নাতি নয়, নেতাজীর নাতি বলে পোস্টার দেওয়াললিখন হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রেডরোডের সর্বদলীয় ঐতিহ্যবাহী নেতাজী জয়ন্তী পালনের পরিবর্তে দার্জিলিঙে নেতাজী জয়ন্তী পালন করতেন কোনো এক অজানা কারণে। পরবর্তী সময় রেডরোডের অনুষ্ঠানে ফিরে আসেন এবং শঙ্খধ্বনি, প্রদীপ প্রজ্বলন করতেন। যদিও লেখক একাধিক বার চিঠি, ই-মেলে নেতাজীর ১২৫তম জন্মদিনটিকে সরকারিভাবে রাজ্যে পালনের জন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেবার আবেদন জানান। নেতাজীর জন্মশতবর্ষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজ্যবাসীকে ২৩ জানুয়ারির দুপুর ১২.১৫ মিনিটে শঙ্খধ্বনি, মানববন্ধন ও সন্ধ্যায় বাড়িতে আলোক প্রজ্বলনের সরকারি আদেশ জানিয়েছিলেন।

২০২১ সালে নেতাজীর ১২৫তম জন্মদিবসে করোনা প্রভাব কিছুটা থাকায় মানববন্ধন নয়, একটু শঙ্খধ্বনি ও আলোকসজ্জার আবেদন ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। লিখিত সেই আবেদন অগ্রাহ্য হলো। মমতা ব্যানার্জি নিজেই রেডরোডে শাঁখ বাজালেন, প্রদীপ জ্বালালেন নেতাজী মূর্তির নীচে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে কি কোনো সাম্প্রদায়িক ভাবনা প্রকাশ পেত! তিনিই ভালো বলতে পারবেন। বিকেলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বহু বিশিষ্ট মানুষজন, ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল ১২৫-এর ঐতিহাসিক সভায়। কিছু উৎসাহী শ্রোতা মমতা ব্যানার্জির বক্তৃতা শুরুর আগে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তোলেন। দৃশ্যত রাগত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নেতাজীজয়ন্তীর ওই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করবেন না বলে জানিয়ে বসে পড়েছেন আসনে।

ঘটনাবহুল ওইদিনে প্রধানমন্ত্রী যান নেতাজীভবনে নেতাজীকে শ্রদ্ধা জানাতে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নেতাজীভবনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি সেদিন। আশ্চর্যের ব্যাপার, নেতাজীভবনের সর্বেসর্বা তৃণমূলের সাংসদ সুগত বসু অন্য রাজনীতিকদের প্রবেশ আটকাননি। নেতাজীভবন শরৎ বসু পরিবারের একাংশ কৃষ্ণা বসুর পুত্ররা কুক্ষিগত করে রেখেছেন।

সেখানে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করে থাকে তা আজও কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে কেন অধিগ্রহণ করেনি তা বিস্ময়কর। যেদিন সুগত বসু তার বাবা শিশির বসু নেতাজীকে মহানিষ্ক্রমণের সময় গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এমন গল্পই প্রধানমন্ত্রীকে বোঝান। শিশির বসুর মিথ্যা ভাষ্য প্রধানমন্ত্রী অজান্তেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভাষণে বলেছিলেন। অবশ্য শিশির বসুর পরিবারের প্রতি দুর্বল (মমতা ব্যানার্জি এক সময় কংগ্রেস দল করতেন এবং শিশির বসু চৌরঙ্গী বিধানসভা থেকে কংগ্রেসের টিকিটে জয়লাভ করেছিলেন) মমতা মহানিষ্ক্রমণে ব্যবহৃত বলে কথিত শিশির বসুর ওই ভুয়ো গল্পের গাড়িটির একদিকের হেডলাইটের কাঁচ সারানোর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষে দেন। বিস্ময়করভাবে মিউজিয়ামে দেওয়া গাড়ির ২৫টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কঠোর নিরাপত্তা ও লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে পরিবর্তন করা হয় ৫০ লক্ষ টাকায়! অর্থাৎ ওই গাড়ির টায়ার চেসিস রং ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটানো হয় যা বিশ্বের কোনো সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে বিরলতম দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। ২০১৬ সালে জানুয়ারিতে মহানিষ্ক্রমণের স্মরণে মমতা ব্যানার্জি নেতাজীভবনের সামনের ফুটপাতে নেতাজীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, পুরসভার পক্ষে কলকাতার নেতাজীভবনের সামনে এবং বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে শ্বেতপাথরের ফলকে শিশির বসুর ছবি, মোটর গাড়ির ছবি ও সুভাষচন্দ্রের ছবি খোদাই করে অনেকগুলি স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

মমতা ব্যানার্জি ফাইল প্রকাশের সময় বলেছিলেন যে তিনি নেতাজীর চিতাভস্ম বিশ্বাস করেন না তিনিই ক্রমশ নেতাজী ইস্যুতে হাইজ্যাক হয়ে গেলেন কৃষ্ণা-সুগতদের পক্ষে। শরৎ বসু রোডে শিশির বসুর বাড়িতে স্থানীয় তৃণমূলের কিছু মানুষ হামলা করলে তৃণমূলের সাংসদ ওই বাড়ির বাসিন্দা সুগত বসু বলেন সুভাষচন্দ্রের বাড়িতে হামলা কেন। জবাবে তাকে বিক্ষোভকারীরা বলেন সুভাষচন্দ্রকে ডেকে আনার কথা। বাস্তবে শিশির বসুর ওই বাড়িতে আদৌ নেতাজী সুভাষচন্দ্র কোনোদিন থাকেননি, থাকার কথাও নয়। অথচ রাজনৈতিক আনুগত্যের ক্ষমতায় কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ ফলক 'ব্লুপ্লাক' বসানো

হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের বাড়িতে। কলকাতা পুরসভার মুখপত্র 'পুরশ্রী'র বিশেষ নেতাজী সংখ্যাটি মেয়র ফিরহাদ হাকিম কৃষ্ণা বসুর দুই পুত্র সুগত ও সুমন্তকে অতিথি সম্পাদক হিসেবে উপস্থাপন করায় যথারীতি নেতাজী সম্পর্কিত অনেক বিকৃতি ও বিচ্যুতি এসেছে।

তাদের প্রকাশিত নেতাজী সম্পর্কিত নানা বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকট ভাবে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যাটিও সেই বিকৃতির শিকার। নেতাজী ভবনে নেতাজী সম্পর্কে অনেক মিথ্যাচার, বিচ্যুতি ও বিকৃতি ঘটেছে ঠিক তেমনটাই মমতা ব্যানার্জির সরকার আলিপুর জেল মিউজিয়াম নেতাজী ভবনের প্রধান সুগতকে দায়িত্ব দেন। তাঁরাও দায়িত্ব নিয়ে ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে বিকৃত উপস্থাপন করেছে। এমনকী রেস্টুরেন্টের খাদ্য পরিবেশকদের আজাদ হিন্দ ফৌজের সাময়িক উর্দি পরিয়ে কাজ করানো হচ্ছিল। এই অভব্য ও অসম্মানজনক কাজ প্রতিবাদের ফলে বন্ধ হলেও নেতাজী কক্ষে শিশির বসুর ভুয়ো গাড়ির গল্প, বিমান দুর্ঘটনা আর মিথ্যা বিবাহের গল্প নেতাজী ভবনের মতোই সাজিয়ে রাখা হয়েছে দর্শনার্থীদের সামনে। মমতা ব্যানার্জি এই ব্যক্তিদের নিয়মিত নেতাজী জন্মজয়ন্তীর মঞ্চে পাশে রেখে গান আর বক্তৃতা করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সরকারি প্রকাশনায় নেতাজীর মিথ্যা বিমান দুর্ঘটনার গল্প, মিথ্যা বিবাহের গল্প, মিথ্যা গাড়ির গল্প প্রকাশ করেছেন। জ্যোতি বসুর আমলে বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে কোনো সরকারি প্রকাশনায় এই মিথ্যাচারগুলিকে প্রচার করা হয়নি। যদিও তারা রাজ্য সরকারের দায়িত্বে থেকে নেতাজী ফাইল প্রকাশের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল সাংসদ কৃষ্ণা বসুর প্রয়াণে পুলিশের গার্ড অব অনার দিয়েছিলেন যা এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। তিনি কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না বা বিশেষ সরকারি পুরস্কার প্রাপকও নন। ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মাত্র। নেতাজী ভবনের প্রাঙ্গণে শিশির বসু ও কৃষ্ণা বসুর মূর্তি বসানো হয়েছে যা সম্পূর্ণ অবান্তর। সেখানে নেতাজীর বাবা জানকীনাথ বসু ও মা প্রভাবতীদেবীর মূর্তি থাকা অনেক যুক্তিসম্মত ছিল। মমতা ব্যানার্জি এই দাবিদার নেতাজী পরিবারের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হন যে জার্মানিতে সরকারি সফরে গিয়ে প্রবাসী ভারতীয় ও জার্মান শিল্পপতিদের কাছে প্রকাশ্য সভায় বলেন যে 'নেতাজী কন্যা অনিতাদি এখানে আছেন। নেতাজী হচ্ছেন আপনাদের জামাই। পশ্চিমবঙ্গে আপনারা অর্থিক বিনিয়োগ করুন' ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল শাসন অবসানের নানা দৃশ্যের সাক্ষী দেশবাসী থেকেছে। বিশেষ করে ইডি আধিকারিকদের তল্লাসিকালে সামনে থেকে বিশেষ একটি সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসাটায় জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। নারদা-সারদা কেলেঙ্কারি, নানা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ না করা, লাল ডায়েরি কিংবা পরীক্ষার্থীদের ওএমআর সিট 'ভ্যানিশ' হওয়া নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়েছিল। কোন অনুপ্রেরণায় সেদিন রাজ্য সরকারের হেফাজতে থাকা নেতাজী ফাইলের অধিকাংশ 'ভ্যানিশ' হয়ে যায়, মাত্র ৬৪টি প্রকাশ হয় তা হয়তো ভবিষ্যতে জানা গেলেও জানা যেতে পারে। একদা ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী নেতাজীর জীবিত থাকা নিয়ে খবর দিলেন। চিতাভস্ম ও 'বিবাহ-কন্যা'র মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে দিনের পরদিন সভাসমিতি করেছেন। এজন্য তাঁকে লালবাজারের লকআপে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। কোথায় গেল সেই সংক্রান্ত ইনটেলিজেন্সের রিপোর্টগুলি?

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের দুনিয়া কাঁপানো ঘটনার ফাইলগুলি কেন রাজ্য সরকার সেদিন প্রকাশ্যে আনলেন না? সই স্বাক্ষরহীন তথাকথিত নেতাজীর 'স্ত্রী' এমিলির নামে টাইপ করা একই বয়ানের ডবল চিঠি চলে এল? রহস্যজনকভাবে ফাইলের কিছু পাতার অংশ ছেঁড়া কেন? এমন অজস্র 'কেন'র উত্তর মেলেনি। বেড়েছে রহস্য। এই প্রতিবেদক নেতাজী তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনে যুক্ত থাকার সুবাদে সেই সময় বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আইবি) ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি)-এর নেতাজী সংক্রান্ত ফাইলের তালিকা, যে ফাইলগুলি কমিশনে আনা হয়েছিল তা পাওয়া যায়। সেই তালিকায় ১৯৪১ সালের গোয়েন্দা রিপোর্ট ইত্যাদি এসেছিল। ৬৪টি প্রকাশিত ফাইলে দেখা গেল কমিশনের তালিকায় অনেকগুলি ফাইল থাকলেও ১২টি ফাইল প্রকাশিত হয়নি এবং ১৩টি নতুন ফাইল ৬৪টি ফাইলের মধ্যে রয়ে গেছে। অবশ্য ওই নতুন ফাইলগুলি খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না।

প্রকাশনা শ্রেণীতে নেতাজীর 'তরুণের স্বপ্ন' বইটি বিনামূল্যে বিতরণের সাধু সিদ্ধান্তের নেপথ্যেও রয়ে গেছে নেতাজী ভবনের সুগত বসুর স্বার্থরক্ষার প্রবণতা। সুভাষচন্দ্র তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' বইটির স্বত্বাধিকার তাঁর সহকর্মী ত্যাগব্রতী গোপাললাল সান্যালের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন কর্তৃক প্রকাশিত (ফেব্রুয়ারি ২০২৪) বইটির স্বত্বাধিকারী ছাপা হয়েছে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর নামে এবং বইটির ভূমিকাও সম্পাদক হিসেবে সুগত বসুর নাম। প্রকৃত বইটিতে গোপাললাল সান্যাল ছিলেন ভূমিকা লেখক। তিনি উহ্যই রইলেন।

নতুন বইটিতে শরৎ বসুর সঙ্গে থাকা ছবিগুলি সংযোজিত হয়েছে। সুগত বসুরা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর ১৯৪৫ সালে মৃত্যুর গল্প প্রচার করেন। কপিরাইট অনুসারে তারা কখনোই নেতাজী রচনাবলী স্বত্বাধিকারী হতে পারেন না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় আজও তারা নেতাজীর বইপত্রের স্বত্বাধিকারী হিসেবে দাবি করেন। অবশ্য সরকারি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইতে সুগত বসুর ছবি-সহ তার বাবার মিথ্যা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার 'গ্রেট এসকেপ'-এর গল্পের একটি অধ্যায় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তখন তিনি তৃণমূল সাংসদ।

তৃণমূল সরকারের নেতাজী ফাইল প্রকাশের একমাস পরেই প্রধানমন্ত্রী নেতাজী পরিবারের মানুষজনকে দিল্লিতে এক বৈঠকে জানান ধারাবাহিক নেতাজী ফাইল প্রকাশের পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি নেতাজী ফাইল প্রকাশের পথপ্রদর্শক হিসেবে বলা গেলেও প্রশ্ন উঠবে মমতা কেন নেতাজী প্রশ্নে বারবার শিখণ্ডী হলেন? ভুয়ো মহানিষ্ক্রমণের ভুয়ো পরিচয় লোপাটে সরকারি কোষাগার থেকে সুগত বসুর ফলকে ৫০ লক্ষ টাকা দিলেন কেন? মমতা ব্যানার্জিকে শিখণ্ডী খাড়া করে দাবিদারদের নেতাজী সত্য গোপনের রমরমা এবং মিথ্যা পল্লবিত হওয়ার মৌন সম্মতি কি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন? এ প্রশ্ন থেকেই যাবে। ❑

যেখানে গঙ্গা সরে যায়, পবিত্রতা থেকে যায়

বঙ্গের নদী-ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির দীর্ঘ অধ্যায়

বিধান হালদার

কালীঘাট মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে কেউ যদি পাশের ক্ষীণ স্রোতটির নাম জানতে চায়, স্থানীয়রা উত্তরে বলবেন 'আদিগঙ্গা'। তাঁরা ভুল বলেননি, সত্যিই এটি আদিগঙ্গা, মা গঙ্গার সেই প্রাচীন প্রবাহ, যা পঞ্চদশ শতকের মঙ্গলকাব্যে চাঁদ সদাগর এই নদীপথ ধরেই বাণিজ্যযাত্রা করেছিলেন। আজ এই স্রোত গুগল ম্যাপে 'Tolly's Nullah', সরকারি নথিতে 'টালি নালা'।

ছোটো থেকে আমরা শুনে এসেছি গঙ্গা ফারাক্কায় ভাগীরথী, নবদ্বীপে হুগলী এবং সাগরদ্বীপের কাছে গঙ্গা নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। তথাকথিত এই বিন্যাস সকলের কাছে পরিচিত, এটি না পৌরাণিক না ঐতিহাসিক, এটি একটি ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক মডেল মাত্র। এই গল্পটি আরও গভীর ও আরও পবিত্র এবং আরও বিস্ময়কর।

ভগীরথের কন্যা : নামের পৌরাণিক মূল

ভারতীয় ভক্তিজীবনে গঙ্গা শুধু একটি নদী নয়, গঙ্গা স্বয়ং দেবী, ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে নির্গতা, শিবের জটায় ধৃতা, মর্ত্যে অবতরণকারী মুক্তিদাত্রী। এই পবিত্র পরিচয়ের কেন্দ্রে আছে সগর-ভগীরথ আখ্যান। বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে (সর্গ ৪২-৪৪) ঋষি বিশ্বামিত্র শিশু রামকে এই কাহিনি বলেন, মহাভারতের বনপর্বে অগস্ত্য মুনি একই আখ্যান বর্ণন করেন এবং বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও শিবপুরাণে এর বিভিন্ন পাঠান্তর পাওয়া যায়। কাহিনির কাঠামো সর্বত্র একই--- রাজা সগরের ষাট হাজার পুত্র কপিল মুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হন; তাদের উদ্ধার করতে অংশুমান ও দিলীপ ব্যর্থ হলে অবশেষে রাজা ভগীরথের কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মা গঙ্গাকে মর্ত্যে পাঠান, মহাদেব জটায় ধারণ করেন, জহ্নু মুনি পান করে জঙ্ঘা চিরে নির্গত করেন (তাই 'জাহ্নবী') এবং অবশেষে গঙ্গাসাগরে পূর্বপুরুষদের ভস্মস্পর্শে মুক্তি দেন।

ব্রহ্মার বরে গঙ্গার নাম হয় 'ভাগীরথী', অর্থাৎ 'ভগীরথের কন্যা' বা 'ভগীরথের প্রচেষ্টায় আনীত'। এখানে একটি সূক্ষ্ম কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন, পৌরাণিক যুক্তিতে এই নাম সর্বত্র প্রযোজ্য। গঙ্গা যেখানেই বইছেন, সেখানেই তিনি ভাগীরথী, তিনি জাহ্নবী। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী থেকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত স্রোতধারাকে আজও 'ভাগীরথী' বলা হয়, সেটিও এই পৌরাণিক যুক্তিরই প্রতিরূপ অর্থাৎ পুরাণ গঙ্গার নামকে ভৌগোলিক সীমান্তে আটকায়নি, তাঁকে দিয়েছে একটি সর্বভারতীয় পবিত্র পরিচয়। বঙ্গে 'ভাগীরথী' নামটিকে একটি বিশেষ ভৌগোলিক অংশের জন্য সংরক্ষিত করা একটি স্থানীয় ঐতিহ্য, সেটি কিন্তু পুরাণের নির্দেশ নয়।

Steven Darian তাঁর The Ganges in Myth and History (১৯৭৮) গ্রন্থে এই পৌরাণিক ব্যাপকতাকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ভারতীয় সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে নদী ও দেবী পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এই অবিচ্ছেদ্যতাই গঙ্গাকে সর্বত্র, সর্বদা পবিত্র মনে করা হয়, যেখানেই মূল প্রবাহ যাক না কেন।

ত্রিবেণী, কালীঘাট ও আদিগঙ্গা

পাঁচশো বছর আগে আজকের কলকাতা ছিল জলাভূমি ঘেরা তিনটি গ্রাম— সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা। তখন গঙ্গা আজকের হাওড়া- শালিমার পথে প্রবাহিত হতো না। হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে, আজ যেখানে কুম্ভস্নান হয়, যা 'মুক্তবেণী' নামে পরিচিত,

গঙ্গা তিন ধারায় বিভক্ত হয়ে একটি শাখা সরস্বতী নামে পশ্চিমে সপ্তগ্রাম-ভুরশুট পথে তাম্রলিপ্তের কাছে সাগরসঙ্গমে; যমুনা (এটি বঙ্গদেশীয় একটি স্থানীয় ধারা, উত্তর ভারতের যমুনা নয়) নামে আগে; আর মাঝখানের মূল ধারা, সেটিই ভাগীরথী, আজকের হেস্টিংস-আলিপুর-কালিঘাট-গড়িয়া-বারুইপুর-ছত্রভোগ পথে সাগরে পড়তো। এই পথটিকেই আজ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে 'আদিগঙ্গা' বলি, অর্থাৎ মূল গঙ্গা।

এই গতিপথের একাধিক প্রমাণ এবং তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-কালীঘাট-ছত্রভোগ-হাতিয়াগড় হয়ে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। ১৫৯৫ সালে আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল সরস্বতী-গঙ্গা-যমুনার জলের রঙের পার্থক্য পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৫৫০ সালের পর্তুগিজ Joao de Barros- এর মানচিত্রে এবং ১৬৬০-এর ওলন্দাজ Van den Brouck -এর মানচিত্রেও হুগলীর জলপ্রবাহ আদিগঙ্গা পথেই দেখানো হয়েছে। সর্বোপরি, কালীঘাট শক্তিপীঠ স্বয়ং একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যদি মূল গঙ্গা আজকের পথে প্রবাহিত হতো, এই পরমপবিত্র মন্দির নদীতীরে বসতো না। কালীঘাট আমাদের বলে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে গঙ্গা কোন পথে বইতো।

দুটি ভিন্ন ঘটনা : প্রাগৈতিহাসিক ভূমিকম্প ও ঐতিহাসিক প্রবাহ-পরিবর্তন

বঙ্গে গঙ্গার মূল প্রবাহ পরিবর্তনের ইতিহাস বুঝতে হলে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কালপর্বের ঘটনাকে আলাদা করে বলা প্রয়োজন।

প্রথম, প্রাগৈতিহাসিক ভূমিকম্প-চালিত avulsion (আনুমানিক ২৫০০ বছর আগে)। Chamberlain ও সহযোগীদের ২০২৪-এর Nature Communications পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণায় OSL luminescence dating -এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, প্রায় ২৫০০ বছর আগে Bengal basin -এ একটি বড়ো ভূমিকম্প (মাত্রা প্রভাব ৭-৮) liquefaction ও sand dike intrusion ঘটিয়ে গঙ্গার mainstream channel -এর একটি আকস্মিক avulsion ঘটায়। OSL -নির্ভর channel-sand-এর তারিখ ২.৬১ + ০.১১ ka এবং infilling muds -এর তারিখ ২.৪৮ ± ০.১৪ ka, দুটি measurement একে অন্যকে নিশ্চিত করে। সম্ভাব্য seismic source হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে Shillong massif অথবা Indo-Burma subduction zone। বর্তমানে গঙ্গার মূলপ্রবাহ সেই পরিত্যক্ত paleochannel -এর প্রায় ৪৫ কিমি উত্তরে। এটি Bengal delta-র মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ relocation, সরাসরি 'পদ্মার দিকে স্থানান্তর' নয়। বুদ্ধ-পূর্ব যুগের এই ঘটনা গঙ্গার দীর্ঘকালীন seismic vulnerability -র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

দ্বিতীয়, ঐতিহাসিক ভাগীরথী পদ্মা shift (১৬-১৮ শতক)। Allison (1998), Goodbred, Kuehl (2000, 2003), Allison ও সহযোগীদের ২০০৩-এর Sedimentary Geology -তে প্রকাশিত প্রবন্ধ অনুযায়ী, Late Holocene -এ ক্রমিক প্রবাহ-পরিবর্তনের একটি দীর্ঘ ধারায় ভাগীরথী-হুগলী ক্রমশ ক্ষীণ হলো এবং পদ্মা মুখ্য প্রবাহ হয়ে উঠলো। এর ঐতিহাসিক প্রমাণ, Rennell-এর ১৭৬৪-৬৭ মানচিত্র-জরিপ, মুঘল রাজস্ব-নথি, ফরাসি পরিব্রাজক Tavernier -এর ১৬৬৬-র বিবরণ, যেখানে তিনি লেখেন রাজমহল থেকে কাশিমবাজার যাওয়ার নদীপথটি 'impracticable'। সরস্বতী শুকিয়ে গেলে সপ্তগ্রাম বন্দরের মৃত্যু, যা বঙ্গের প্রাচীনতম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ঠিক তখনই নতুন প্রবাহপথে সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলিকাতা গভীর জলে বন্দরযোগ্য হয়ে ওঠে।

এই দুটি ঘটনার মধ্যে প্রায় ২ সহস্রাব্দের ব্যবধান। প্রাগৈতিহাসিক ভূমিকম্প-চালিত avulsion আমাদের জানায় যে, Bengal delta seismically vulnerable, কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যে শিফট বঙ্গের বাণিজ্যিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভূগোলকে নতুন আকার দিয়েছে, সেটি একটি ভিন্ন, কিন্তু সমান নাটকীয় প্রক্রিয়া। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বাঙ্গালি হিন্দু সংস্কৃতি এই ভৌগোলিক পরিবর্তনের পরেও পবিত্রতার মুকুট কালীঘাট থেকে সরায়নি। মূল প্রবাহ অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু কালীঘাট আজও মা গঙ্গার পবিত্র সঙ্গমে দেবী কালীর শক্তিপীঠ হিসেবে রয়ে গেছে। এই সাংস্কৃতিক স্মৃতির শক্তি এমনই যে ভূগোল পরিবর্তিত হয়, তবুও পবিত্রতা অটুট থাকে।

Rennell -এর 'বড় গঙ্গা'

১৭৬৪ সালে James Rennell ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জরিপ-অধিকর্তা, পরে যিনি 'Father of Indian Geography' নামে পরিচিত, কলকাতা থেকে ঢাকার নৌপথ অনুসন্ধানে বের হন। তাঁর জার্নাল ও মানচিত্রে তিনি আজকের পদ্মাকে চিহ্নিত করেছেন 'Ganges', অর্থাৎ গঙ্গা নামে। এই নামটি তাঁর নিজের কল্পনা নয়, স্থানীয় বাঙ্গালি মাঝিরা তাঁকে হয়তো এই নামেই বলেছিলেন। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকেও বঙ্গের মাঝি-সম্প্রদায়ের কাছে পদ্মাই ছিল মূল গঙ্গা।

এই সাক্ষ্যটি পবিত্রতার ঐতিহ্যের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ? উত্তরটি সম্ভবত এইরকম— পুরাণে যুক্তি অনুযায়ী গঙ্গা সর্বত্রই বিরাজ করেন। তিনি ভাগীরথীতে আছেন, পদ্মাতেও আছেন। ভৌগোলিক 'মূল' আর পৌরাণিক 'পবিত্র', এই দুটি ভিন্ন প্রশ্ন।

বাঙ্গালি হিন্দু কালীঘাট- গঙ্গাসাগর-ত্রিবেণীতে যে গঙ্গাকে পূজা করেন, তিনি পদ্মার মধ্যেও বহমান। মা গঙ্গার পবিত্রতা ভৌগোলিক প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে না। নদী গবেষক কল্যাণ ভদ্র, যিনি Rennell -এর 'বেঙ্গল অ্যাটলাস'-এর আধুনিক সম্পাদিত পুনর্মুদ্রণ (২০১৬) প্রকাশ করেছেন এবং চার দশক ধরে বঙ্গীয় নদীব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করছেন, তিনি একটি পরিমাপ দিয়ে বলেছেন, ভাগীরথী বছরের প্রায় নয় মাস গঙ্গা থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন থাকত। এই নয় মাস গঙ্গা জল পায় ১৯৭৫ সালে চালু হওয়া ৩৮ কিমি দীর্ঘ ফরাক্কায় তৈরি কৃত্রিম প্রকৌশল- কাঠামো বা ফিডার ক্যানাল থেকে।

ভাগীরথী-পদ্মার বিভাজন-বিন্দুও স্থির নয়। গত ছয়শো বছরে এটি ক্রমান্বয়ে পূর্বদিকে সরেছে— মালদা জেলার গৌড়ের

কাছ থেকে শুরু করে ধুলিয়ান, সুতি, গিরিয়া হয়ে আজকের মিঠিপুর (জঙ্গিপুরের কাছে) পর্যন্ত। প্রতিটি পর্যায়ে পুরনো বিভাজিত বিন্দু পলি জমা হয়ে বন্ধ হয়েছে। ১৯১৯ সালে গিরিয়া-বিন্দু চূড়ান্তভাবে বন্ধ হলে কলকাতা বন্দরের সংকট চরমে ওঠে, যা ৫৬ বছর পরে ফিডার ক্যানালের দ্বারা সেই সংকট মোচন হয়।

এই ফিডার ক্যানালের প্রধান লক্ষ্য ছিল কলকাতা বন্দরের পলি-সমস্যা ও লবণাক্ততা হ্রাস। এর গভীরতর তাৎপর্য, ভগীরথ একদা গঙ্গাকে এনেছিলেন; ১৯৭৫ সালে ভারতীয় প্রকৌশলীরা একটি নবীনপর্বে গঙ্গাকে ভাগীরথীতে ফিরিয়ে আনলেন। এই কাজে কোনো অশ্রদ্ধা নেই, বরং পবিত্র নদীকে রক্ষার একটি আধুনিক প্রচেষ্টা।

পর্তুগিজ-ব্রিটিশের অলক্ষ্য উত্তরাধিকার

'হুগলী' নামটিও বহুল ভ্রান্তির শিকার। জনপ্রিয় ধারণা, ব্রিটিশরা এই নাম দিয়েছে। সত্য হলো, পর্তুগিজরাই ১৫৩৭ সালে হুগলী শহর প্রতিষ্ঠা করে এবং নদীতীরের জলাভূমিতে প্রচুর হোপলা ঘাস দেখে স্থানীয় নাম থেকে 'Ugulim' রূপে নথিভুক্ত করে। ১৯১১ সালের Encyclopaedia Britannica থেকে জানা যায়, শহর ও জেলা নদী থেকে নাম পেয়েছে। ব্রিটিশরা পরে এই নামকে মানচিত্রে স্থায়ী ও মানসম্মত করে। পর্তুগিজ মানচিত্রে নদীর নাম ছিল 'Rio de Ugulim' বা 'Rio Hugli', যা পরবর্তীতে সমগ্র ইউরোপীয় কার্টোগ্রাফিতে ছড়িয়ে পড়ে।

Rennell-এর প্রকৃত অবদান ছিল আমলাতান্ত্রিক, তিনি 'ভাগীরথী' আর 'হুগলী' নামকে দুটি সংলগ্ন অংশের জন্য নির্ধারিত করেন, যদিও স্থানীয় বাঙ্গালি একে সর্বদা 'গঙ্গা' বলত। এই দ্বিপক্ষী নাম-ব্যবস্থা আজও পাঠ্যপুস্তকে বহাল। নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে (১৭৩৯-১৭৫৬) ওলন্দাজ প্রকৌশলীরা গার্ডেনরিচে একটি এক কিমি খাল খনন করে সরস্বতী-আদিগঙ্গাকে সংযুক্ত করেন, পরে ১৭৭৫-৭৭ সালে কর্নেল উইলিয়াম টোলি এই কাজের সম্প্রসারণ করেন এবং আদিগঙ্গাকে বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে যুক্ত করেন। সেই থেকে নাম 'Tolly Nullah'। যে স্রোতকে আমরা ভক্তিভরে আদিগঙ্গা বলি, ব্রিটিশ মানচিত্রে সেটি একজন কর্নেলের নামে চিহ্নিত হলো। এই নাম-অধিকারই ঔপনিবেশিকতার সবচেয়ে গভীর উত্তরাধিকার।

পবিত্রতার ভূগোল ও ভৌগোলিক পবিত্রতা

তাহলে প্রকৃত গঙ্গা কোথায়? এই প্রশ্নটির বহুমাত্রিক উত্তর— ঐতিহাসিকভাবে, গঙ্গার মূল প্রবাহ গত ২৫০০ বছরে কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক ভূমিকম্প থেকে শুরু করে Late Holocene -এর ক্রমিক shift পর্যন্ত। কিন্তু পৌরাণিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে, গঙ্গা সর্বত্র, সব ধারায়, সব সময় প্রবহমানও। তিনি ভগীরথের কন্যা, তিনি জাহ্নবী, তিনি দেবী।

বঙ্গের নদী-ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন বিদেশি আকর হলো আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রিক ভূগোলবিদ Claudius Ptolemy-র Geographia (আনু. ১৫০ খ্রি.। রুদ্র (১৯৮১) দেখিয়েছেন, Ptolemy-র বর্ণিত গঙ্গা-মুখগুলির পরিচয় করা যায় আজকের সাগরদ্বীপ-হলদিয়া-তাম্রলিপ্ত উপকূলরেখার সঙ্গে, কিন্তু সেই উপকূলরেখা আজকের চেয়ে অনেক উত্তরে ছিল। অর্থাৎ ১৫০ খ্রিস্টাব্দে যে স্থান সমুদ্রের পাড় ছিল, আজ তা সমুদ্রের অভ্যন্তরে। সমুদ্র সরে যাওয়া ও বদ্বীপের বৃদ্ধি, গঙ্গার মূল প্রবাহ-পরিবর্তনের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছে। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে 'গঙ্গা' বলতে যা বোঝাতো, সেটি আজকের ভাগীরথী-হুগলীর পথ নয়, এমনকী আদিগঙ্গার পথও পুরোপুরি নয়; বরং এর পশ্চিম দিকের সরস্বতীর পথ। অর্থাৎ 'গঙ্গা' নামের প্রবাহটি গত ২০০০ বছরে কয়েক শত কিলোমিটার পূর্বদিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

একজন প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে নদীর নামকরণ কখনোই নিছক ভাষাবিদ্যার বিষয় নয়। এটি ভূদৃশ্য, ক্ষমতা ও স্মৃতির সংঘাতের ফলাফল। কালীঘাট আজও আদিগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে। এই একটি স্থান একাই ফরাক্কা, নবদ্বীপ-সাগর পাঠ্যপুস্তকের সরল মডেলকে ভেঙে দেয়। বঙ্গে গঙ্গা একটি নদী নয়, একটি বহু-অর্থবহ পবিত্র ভূদৃশ্য, যেখানে পুরাণ, পলি ও মানচিত্র দুই হাজার বছর ধরে একে অন্যকে রচনা করে চলেছে।

এই নিবন্ধের কেন্দ্রীয় যুক্তি একটিই— পবিত্রতা ও ভৌগোলিক বাস্তবতা পরস্পরের শত্রু নয়, বরং পরিপূরক। ভাগীরথীর প্রবাহ যন্ত্র-নির্ভর হলেও কালীঘাটের শক্তি অপরিবর্তিত। গঙ্গাসাগরের তীর্থ-আনুষ্ঠানিকতা পদ্মা-প্রবাহের সঙ্গে অবিকল না মিললেও কপিলমুনির আশ্রম-স্মৃতি অটুট।

পুরাণে ভগীরথ গঙ্গাকে এনেছিলেন স্বর্গ থেকে; বঙ্গের ব্রাহ্মণ্য-বৈষ্ণব ঐতিহ্য সেই গঙ্গাকে ধরে রেখেছে হাজার বছরের ভৌগোলিক পরিবর্তনের মধ্যেও। নদী চলে গেছে; নাম থেকে গেছে; পবিত্রতা স্থানান্তরিত হয়েছে। এই বঙ্গ, এই বাঙ্গালির পবিত্র ভূগোল, যেখানে নদীর প্রবাহ পরিবর্তনশীল, কিন্তু সেই প্রবাহের প্রতি আমাদের ভক্তি অপরিবর্তনীয়। ◘

শোক সংবাদ

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাঁটি খণ্ডের রাধাকৃষ্ণপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা দীর্ঘদিনের প্রচারক বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ কাজল মণ্ডলের বড়দাদা খাঁদুরাম মণ্ডল গত ৯ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন প্রচারক সুনীল (মলিন) দে'র সহধর্মিণী জয়ন্তী দে গত ১৮ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুরের (রাজপুর) বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি সমস্ত হিন্দু সংগঠনের কাজে সহযোগিতা করতেন।

কমরেড! হাসান সুরাবর্দির গুণগান না গোপাল মুখার্জির অবদান : কার সঙ্গে আপনারা?

বিপ্লব বিকাশ

ইতিহাসের অলিগলিতে অনেক কুযুক্তিই লুকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের আবেগ আর বাস্তবতার সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। আজ বামপন্থী বা তথাকথিত প্রগতিশীলরা দাবি তুলছেন যে, সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম নাকি হোসেন শহিদ সুরাবর্দির নামে নয়, বরং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা উপাচার্য স্যার হাসান সুরাবর্দির নামে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন, এক সপ্তাহ আগে এই তথ্যের কথা সাধারণ মানুষের মধ্যে কজন জানতেন? 'সুরাবর্দির' নামটা শুনলে কলকাতার বা আপামর বাঙ্গালির মনে সবার আগে কার ছবি ভেসে ওঠে? ওই একটা নামেই বাঙ্গালির স্মৃতিতে প্রকট হয়ে ওঠে ১৯৪৬ সালের সেই রক্তঝরা 'ক্যালকাটা কিলিং'-এর কালো দিনগুলো, যার মূল খলনায়ক ছিলেন ব্রিটিশ বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হোসেন সুরাবর্দি। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে বসে তিনি হিন্দু নিধনের নীলনকশা তৈরি করেছিলেন, তার নামের সেই উপাধি কলকাতার বুকে সগৌরবে টিকে থাকবে, আর যিনি নিজের প্রাণ বাজি রেখে কলকাতার হিন্দুদের রক্ষা করেছিলেন, তাঁকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হবে— এটা কোনো স্বাভিমানী সমাজ মেনে নিতে পারে না।

উপাচার্য হিসেবে কার কী প্রশাসনিক অবদান ছিল, তা ইতিহাসের পাতায় থাক, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নিজের অস্তিত্ব ও জীবন বাঁচানোর চেয়ে বড়ো আর কিছু হতে পারে না। উপাচার্য সুরাবর্দির চেয়ে একজন বীরের, একজন জননেতার এবং সাধারণ মানুষের চোখে বন্দনীয় এক রক্ষাকর্তা গোপাল মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনেক বেশি। গোপাল মুখোপাধ্যায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বড়ো চেয়ারে বসেননি ঠিকই কিন্তু ১৯৪৬ সালের সেই চরম সংকটের দিনে তিনি কলকাতার হিন্দুদের জন্য সাক্ষাৎ দেবদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জেনেশুনে বা অজান্তে যে নামটা কলকাতার একটা প্রধান রাস্তার সঙ্গে জুড়ে ছিল, তা পরোক্ষভাবে সেই রক্তপিপাসু ঘাতক সুরাবর্দির স্মৃতিকেই উসকে দেয়। কলকাতার মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শহরে, যেখানে হিন্দু সমাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল, সেখানে সেই সমাজের রক্ষাকর্তা গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নামে রাস্তার নামকরণ হওয়াটা কেবল যুক্তিযুক্তই নয়, অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত।

অথচ আজ যখন সেই বীরের সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তখন বামপন্থীদের বুক ফেটে কান্না আসছে। আসলে এই বামপন্থীদের 'দ্বিচারিতা' বা ভণ্ডামির ইতিহাস আজকের নয়; এর শিকড় লুকিয়ে আছে ১৯৪৬ সালের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতেই। সেই সময় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি মুখে শান্তির কথা বললেও পর্দার আড়ালে মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন জুগিয়েছিল। তারা হিন্দুদের আত্মরক্ষার লড়াইকে 'দাঙ্গাবাজি' বলে দেগে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, অথচ মুসলিম লিগের উগ্র জেহাদিপনাকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিল। এই দ্বিচারিতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মেলে তৎকালীন তরুণ কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর ভূমিকায়। হিন্দু হত্যার সেই ভয়াবহ আবহেও হোসেন সুরাবর্দির সঙ্গে জ্যোতি বসুর অত্যন্ত মধুর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে সুরাবর্দির সেই তোষণকারী ও হিন্দুবিদ্বেষী নীতিকে আড়াল করতে বামপন্থীরা সবসময় নরম মনোভাব দেখিয়েছে। যে সুরাবর্দির হাত হিন্দুদের রক্তে লাল ছিল, তার সঙ্গে দোস্তি বজায় রেখে বামপন্থীরা প্রমাণ করেছিল যে তাদের কাছে হিন্দুর জীবনের চেয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আজ ২০২৬ সালেও সেই একই মানসিকতার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। যারা আজ এই নামকরণের বিরোধিতা করে সুরাবর্দি নামের আড়ালে ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি করছেন, তারা আসলে হিন্দুদের আত্মত্যাগকে এবং বাঙ্গালির বীরত্বের ইতিহাসকে চরম অপমান করছেন। তারা চায় বাঙ্গালি সর্বদা ভীরুতা ও কাপুরুষতার বৃত্তে বন্দি থাকুক এবং নিজেদের রক্ষাকর্তাদের ভুলে যাক। কিন্তু সত্যকে বেশিদিন চেপে রাখা যায় না।

কলকাতার বুকে গোপাল মুখার্জি রোডের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক আর কোনো নাম হতে পারে না, কারণ তিনি কোনো সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করতে যাননি, বরং আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে কলকাতার অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন। সমাজকে বিভ্রান্ত করার এই বামপন্থী অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে আমাদের নিজেদের ইতিহাস এবং প্রকৃত নায়কদের সগৌরবে স্মরণ করার সময় এসেছে। ◻

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৮৮)

সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব দর্শন

শেষপর্যন্ত জাক্তারজী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কয়েকদিন দেওলালীতে বিশ্রাম গ্রহণে সম্মত হলেন। এই সম্মতি প্রদানের পেছনে দুটি কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, তিনি নিজেই ক্রমাগত স্বাস্থ্য অবনতি, শারীরিক দুর্বলতার অনুভব করছিলেন। দ্বিতীয়ত, নাগপুরের সঙ্ঘচালক বাবাসাহেব ঘটাটে অনুরোধ করেন পুনা থেকে ফেরার পথে কিছুদিন দেওলালীতে থাকার জন্য। নাসিক থেকে আট ৯ মাইল দূরে নিরিবিলি স্বাস্থ্যানুকূল বায়ু সম্পন্ন স্থান দেওলালী। শ্রী ঘটাটে সেখানে একটি বাংলো ভাড়া নিলেন। ফুল, লতা-পাতা গাছপালা ঘেরা, শীতলতা সব মিলিয়ে একটি মনোরম স্থান দেওলালী। ডাক্তারজীর দেখাশোনার জন্য সঙ্গে শ্রীগুরুজী ও তাত্যা তেলঙ্গও এসেছেন। দূরে হলেও নাসিক থেকে এবং দেওলালীর স্বয়ংসেবকরা ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। নিয়মিত স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে আলোচনা, বৈঠক, পত্র ব্যবহার, প্রয়োজনীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানানো, কোনোটাই খামতি ছিল না।

ওষুধ পথ্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীগুরুজী ও তাত্যা তেলঙ্গই ডাক্তারজীর দেখাশোনা করতেন। বর্ষা শুরু হয়েছে। ডাক্তারজী একটু শারীরিক সুস্থতা বোধ করছিলেন, কিন্তু যতটা সুস্থ তিনি বোধ করছিলেন প্রচার তার থেকে বেশি ভালো বলেই করছিলেন— তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন বলে সকলের ধারণা তৈরি করার জন্য। তাই নাগপুরে পৌঁছানো ও প্রবাসের ছক তৈরি হলো। ফেরার পথে নাসিকে শিবাজী পার্কে স্বয়ংসেবকদের সম্মুখে সকাল ৯টায় ভাষণ হলো। দুপুরে কেশব জগন্নাথরাও আকুত (কাকারাও) ব্যবহারজীবীর বাড়িতে সবার ভোজন ব্যবস্থা ছিল। ভোজনের সময় দেখা গেল ডাক্তারজী কম কথা বলছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে কোনো মতে খাচ্ছেন। ডাক্তারজীর তখন শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, ১০৩ ডিগ্রি জ্বর। আবার দেওলালী নিয়ে যাওয়া হলো। চিকিৎসার জন্য নাসিক থেকে ডাঃ গোবিন্দ রাও দামলে এবং ডাঃ পাণ্ডুরঙ্গরাও চোবে এলেন। জানা গেল ডাক্তারজী ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। বর্ষার জল কাদা ভেঙে নাসিক থেকে স্বয়ংসেবকরা নিয়মিত এসে ডাক্তারজীর সেবা করতে লাগলো। চিকিৎসকরা দু-বেলাই আসছেন। একদিন তো এমন হলো জ্বরে অজ্ঞান হয়ে থাকলে চিকিৎসকরা অবস্থা খারাপ বুঝে বাড়ির লোকেদের খবর দিতে বললেন। সে সময় শ্রীগুরুজীর সেবা ও শুশ্রূষা ছিল অভূতপূর্ব। জল গরম করা, ওষুধ দেওয়া, পিঠে সেঁক দেওয়া, জ্বর দেখা, জামা কাপড় পালটানো সব করতেন। নাসিকের এক প্রবীণ উকিল এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন— 'ডাক্তারজীর সব কাজ শ্রীগুরুজী পাঠাশালার ছাত্রের মতো তৎপরতার সঙ্গে করতেন।'

ডাক্তারজীর এই প্রচণ্ড অসুস্থতা, নিরন্তর সেবার ফাঁকে শ্রীগুরুজীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক অসাধারণ সেবাপরায়ণ মানুষের ছবি। কয়েকদিন সেই সংকটময় অবস্থার মধ্যে অচৈতন্য থাকার সময়ও অস্ফুটে কথার মধ্যে সঙ্ঘের জন্য তার আকুলতা প্রকাশ পেত— 'চল, আমাকে ঠিক সময়ে পৌঁছতে হবে, নগর থেকে কোনো চিঠিপত্র এল না কেন'? ডাক্তারজীর নিজের অন্তঃচেতনার ওপর এমন নিয়ন্ত্রণ ছিল যে অচৈতন্য অবস্থা, প্রলাপের মধ্যেও তাঁর মুখ থেকে যে অস্ফুট শব্দ বেরোতো তার মধ্যে কোনো ব্যক্তির প্রতি অনুদারতা, ঈর্ষার মনোভাব, কারও সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা কখনো প্রকাশ পায়নি। দেওলালীর এই দু'সপ্তাহের অভিজ্ঞতার বিষয়ে পরবর্তীকালে শ্রীগুরুজী বলেছিলেন— "মানুষ পরখ করার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। একেবারে প্রথম দিকে ডাক্তারজী সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল যে তিনি এক অভিনব পদ্ধতিতে কর্মরত নেতা। এছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মাত্র পনেরো-ষোলো দিনের এই অবিরাম সান্নিধ্য লাভের পর আমি প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম যে সাধারণ মানুষের মতো আচরণকারী এই পুরুষটির মধ্যে অবশ্যই কোনো অদৃশ্য অসাধারণত্ব রয়েছে।"

সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস